৮

এই ইউনিটের পাঠগুলোর মধ্যে যৌক্তিক যোগসূত্রটি হচ্ছে: প্রথমে দারিদ্র্য কি এবং তার প্রকারভেদ ও পরিমাপের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে সাধারনভাবে। দ্বিতীয় পাঠে এসব ধারনার বিশেষ প্রয়োগ দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে। তৃতীয় পাঠে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে শেষ বিচারে "দারিদ্র" একটি আপেক্ষিক বহুমাত্রিক প্রত্যয়। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্য এবং আপেক্ষিক দারিদ্র্যের টিকে থাকার পেছনে যেসব বিষয়গত ও বিষয়ীগত কারণ বিদ্যমান তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ পাঠে দারিদ্যের এসব কারণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিভিন্ন ধরনের রণকৌশলের সমালোচনা মূলক বিশ্লেষন উত্থাপিত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

□ পাঠ-১. দারিদ্র্য ঃ সংজ্ঞা ও পরিমাপ

□ পাঠ-২. দারিদ্র্যের হার ঃ গতি -প্রবনতা

□ পাঠ-৩. আপেক্ষিক দারিদ্র্য ঃ আয়, সম্পদ ও সুযোগের বৈষম্য

□ পাঠ-৪. দারিদ্র্য ঃ কার্যকারণ বিশ্লেষন

□ পাঠ-৫. দারিদ্র্য নিরসনের উন্নয়ন কৌশল

পাঠ-৮.১ ঃ দারিদ্র্য : সংজ্ঞা ও পরিমাপ

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- দারিদ্র্যের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞাগুলো কি;
- দারিদ্র্য পরিমাপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পন্থাগুলো কি;
- "মৌসুমী দারিদ্র্য" কাকে বলে? দারিদ্র্য পরিমাপের অপ্রত্যক্ষ মাপকাঠিগুলো কি;
- কেন "দারিদ্র্য" কে একটি আপেক্ষিক প্রত্যয় হিসাবে ধরা উচিৎ;
- সর্বশেষে "দারিদ্র্য ধারনাটির" বিকল্প সমালোচনাটি কি।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা

দারিদ্র্য: মানুষের এক বিশেষ মাত্রার বঞ্চনামূলক অবস্থা। সমাজে যে সব মানুষ ন্যুনতম অন্ন, বস্ত্র শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকে অর্থাৎ যারা মানুষ হয়েও মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয় (ইচ্ছাকৃত ভাবে সন্নাসী বা বৈরাগী জীবন-যাপনকারী ব্যক্তিদের দরিদ্র বলা যাবে না। তাদেরকেই আমরা দরিদ্র বলে থাকি।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা প্রধানত: দুই ধরনের -ক একমাত্রিক ও খ. বহুমাত্রিক।

একমাত্রিক সংজ্ঞানুসারে দরিদ্র লোককে চিহ্নিত করা হয় বঞ্চনার বিশেষ একটি মাপকাঠি ও স্তরকে ব্যবহার করে।

একমাত্রিক সংজ্ঞানুসারে দরিদ্র লোককে চিহ্নিত করা হয় বঞ্চনার বিশেষ একটি মাপকাঠি ও স্তরকে ব্যবহার করে। যেমন: আয় দারিদ্র্য অর্থাৎ সমাজে যাদের আয় দারিদ্র্য আয় রেখার নিচে তাদেরতে আয়ের দিক থেকে দরিদ্র্য হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পরে। অনরূপ ভাবে পুষ্টি দারিদ্র্য, শিক্ষা দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অধিকারের বঞ্চনা ভিত্তিক দারিদ্র্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ন্যুনতম বঞ্চনা নির্ণয় সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের এক মাত্রিক দারিদ্র্য অবস্থাকে চিহ্নিত করা সম্ভব।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সাধারনত: অনেকগুলো একমাত্রিক দারিদ্র্যের সম্বিলিত সহাবস্থানের সূচক।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সাধারনত: অনেকগুলো একমাত্রিক দারিদ্র্যের সম্বিলিত সহাবস্থানের সূচক। অর্থাৎ কেউ যদি একই সঙ্গে আয়, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ন্যুনতম নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম পায়, তাহলে তাকে সর্বাদিক থেকে বঞ্চিত বা বহুমাত্রিক দারিদ্র বলা যেতে পারে।

বঞ্চনার স্তর ভেদেও "দারিদ্র্য"কে দু-রকম ভাবে দেখা যায়। খুব বেশি বঞ্চিতদের আমরা বলতে পারি "চরম দারিদ্র্য" (Extreme poor)। আর অপেক্ষাকৃত কম বঞ্চিতদের আমরা বলতে পারি "দারিদ্র" । (Moderate poor)।

মনে রাখা প্রয়োজন যে একাধিক দারিদ্র্য তথ্যভান্ডারের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র্য ধারনা হলেও এর পরিমাপযোগ্যতা বেশি এবং অপেক্ষাকৃত সহজ।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের ধারনা তথ্য ভান্ডারের দিক থেকে ধনী হলেও, এর পরিমাপযোগ্যতা সহজ নয়।

দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি

সবচেয়ে জনপ্রিয় একমাত্রিক দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি হচ্ছে "পুষ্টি দারিদ্র্য" বা "আয় দারিদ্র্য" পরিমাপ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতেই বর্তমানে বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্যের হার মাপা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের গড় আবহাওয়া, মানুষের আয়তন, দৈনিক শক্তিক্ষয়, কর্মক্ষমতা ইত্যাদি বিচার করে শরীরবিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন এদেশে একজন গড়পড়তা প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ন্যুনতম বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন গড়ে ২১১২ ক্যালরি দরকার। মোটামুটি এই পরিমান ক্যালনি আহরনের

জন্য দামী অথচ ক্যালরি বহুল যেসব খাদ্য দরকার (যেমন মাছ/মাংস নয় ডাল, সরুচাল নয় মোটা চাল ইত্যাদি) তার একটি তালিকা প্রথমে পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা তৈরি করেন। এই ন্যুনতম খাদ্য তালিকাকে "দারিদ্র্য খাদ্য সমষ্টি" বলা হয়। এদের যে বাজার দাম তাদের যোগফল কে "দারিদ্র্য আয়" বলে অভিহিত করা হয়। এই আয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি বাজার অর্থনীতিতে (যেখানে বেশিরভাগ ভোগ্য পণ্য হিসাবে কিনে ভোগ করতে হয়) কারো এই ন্যুনতম আয় না থাকলে তার পক্ষে ন্যুনতম জীবনধারন সম্ভব নয় বা "শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন" সম্ভব নয়।

দারিদ্র্য আয়-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি। বাজার অর্থনিতিতে কারো এই ন্যুনতম আয় না থাকলে তার পক্ষে ন্যুনতম জীবনধারন সম্ভব নয় বা "শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন" সম্ভব নয়।

এরপর এই ন্যুনতম আয় বঞ্চিত লোকদেরকে "দরিদ্র" হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের মাথা-গননা করে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ তারা সে হিসাব নির্নয় করা হয়। এই ছোট হিসাবকৃত সংখ্যা বা "শতাংশকে" সেই দেশের "মাথা গণনা ভিত্তিক দারিদ্র্যের হার" বলা হয়। যে দেশে এই হার যত বেশি সে দেশের দারিদ্র্যর অবস্থা তত খারাপ বলে বিবেচিত হয়।

লক্ষ্যণীয় উপরোক্ত পরিমাপ পদ্ধতিতে কতক পূর্বনির্ধারিত মূল্যবোধ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ন্যুনতম ক্যালরি কত হবে তা "ব্যক্তির বিশেষ অবস্থা" নির্ধারিত না করে নির্ণয় করা আদৌ সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির "খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ ক্ষমতা" দিগুন সে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির তুলনায় অর্ধেক খাদ্য নিয়ে সমান ভাল অবস্থায় থাকতে পারবেন (দ্রঃ এ, কে, সেন ১৯৮৫)। আবার কোন্ খাদ্য দ্রব্যগুলো এমনিতেই স্বউৎপাদিত হবে বা কুড়িয়ে পাওয়া যাবে, এদের কোন দামটি দরিদ্র লোকের জন্য কার্যকরি হবে, শুধু খাদ্যই কি যথেষ্ট ইত্যাদি অনেকগুলো অমিমাংসিত প্রশ্নের পূর্বনির্ধারিত কোন না কোন ধরনের মীমাংসা ছাড়া কোন দেশের সংক্ষিপ্ত "দারিদ্র্য হার সূচকটি" নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সাধারনভাবে একবার একটি "সূচক" ও "সূচক নির্নয় পদ্ধতি" নির্ধারিত হয়ে গেলে সেটি একাদিক্রমে প্রবনতা অনুধাবন করা সম্ভব। তবে একদেশের দারিদ্র্যের হার অন্য দেশের দারিদ্র্যের হারের সঙ্গে তুলনা করাটা অসম্ভব না হলেও, খুব সতর্কতার সঙ্গেই তা করা উচিৎ।

বাংলাদেশে সাধারনতঃ ২১১২ ক্যালরী খাদ্যের জন্য যে "দারিদ্র্য খাদ্য বাক্স" চিহ্নিত করা হয়েছে তার দাম প্রথমে হিসাবে করা হয়েছে এবং তার পর এর সঙ্গে ঐ দামের ৩০ শতাংশ আরো যোগ করে "দারিদ্র্য আয় রেখা" নির্নয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সাধারনতঃ ২১১২ ক্যালরী খাদ্যের জন্য যে "দারিদ্র্য খাদ্য বাক্স" চিহ্নিত করা হয়েছে তার দাম প্রথমে হিসাবে করা হয়েছে এবং তার পর এর সঙ্গে ঐ দামের ৩০ শতাংশ আরো যোগ করে "দারিদ্র্য আয় রেখা" নির্নয় করা হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য এখানে শুধু পুষ্টি ভিত্তিক দারিদ্র্য আয় রেখাকে আলাদা ভাবে হিসাব করে সেই রেখাটিকে "চরম দারিদ্র্য আয় রেখা" হিসাবে অভিহিত করেছেন। সাধারণভাবে চরম দরিদ্র আয় রেখার সঙ্গে আরো ৩০ শতাংশ বর্ধিত আয় যোগ করে বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন বৎসরে যে বিভিন্ন মাথাপিছু দারিদ্র্য আয় রেখা নির্নীত হয়েছে তার একটি সারণী নিচে প্রদান করা হল।

সারণী ৮.১ ঃ মাথাপিছু দারিদ্র্য আয়

বছর	টাকা	বছর	টাকা
১৯৭৩/৭৪	১১৫০	১৯৮৫/৮৬	৩৭০১
১৯৮১/৮২	২২২৭	১৯৮৮/৮৯	৪৩৪০
১৯৮৩/৮৪	৩১৫০	১৯৮৯/৯০	৪৭৯০

উৎসঃ বিনায়ক সেন, ১৯৯৭

লক্ষনীয় যে "দারিদ্র্য রেখা আয়" প্রতিবছর কিছু কিছু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে "দারিদ্র্য বাক্সভুক্ত" খাদ্য দ্রব্য সমূহের দাম বৃদ্ধি। মুদ্রাস্ফীতির হিসাব জানা থাকলে এই সারণী থেকে আগামী দিনের দারিদ্র্য আয় মাত্রাটি সহজেই নিরূপনযোগ্য।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি

গবেষনায় দেখা গেছে যে যারা সাধারনত: আয় মাত্রার দিক থেকে দারিদ্র তারা অন্যান্য মাত্রার নিরিখেও দারিদ্র হয়ে থাকে।

পুষ্টিবিদরা অনেকসময় দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে দারিদ্র্য নির্ণয় করেন। সাধারনত: তাদের কাছে বিভিন্ন উচ্চতার সঙ্গে বিভিন্ন ওজনের যে গড় তালিকা রয়েছে সেটি ব্যবহার করে তারা দরিদ্র লোককে চিহ্নিত করেন। বিশেষত শিশুদের ক্ষেত্রে উচ্চতার তুলনায় ওজন কম হলে, তাদের পুষ্টি ঘাটিতে সহজেই অনুমেয়। এ ধরনের বাহ্যিক দৈহিক ভিত্তিক দারিদ্র্য পরিমাপকে ইংরেজীতে "Anthropometic Measure of Poverty" বলা হয়।

অনেক সময় খাদ্য তালিকা "প্রোটিনের" ঘাটতি বা মোট যে খাদ্য খাওয়া হচ্ছে তার পুষ্টি মূল্য (ক্যালরী হিসাবে মাপা হয়) হিসাব করেও পুষ্টিবিদরা দারিদ্র্য মাপতে চেষ্টা করেন।

পুষ্টি অবস্থার প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ছাড়া, বস্ত্র ভোগমাত্রা, স্বাস্থ্য ও পয়:প্রনালীর অবস্থা, নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ, চিকিৎসা সুযোগ, নিরাপত্তা মাত্রা, সম্পত্তির মাত্রা, গৃহায়ন অবস্থা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান ও কোন না কোন ধরনের পরিমাপ সম্ভব। গবেষনায় দেখা গেছে যে যারা সাধারনত: একমাত্রিক আয় দারিদ্রের দিকেই বেশি পরিমানে ঝুঁকছেন। তবে পাশাপাশি বিশেষ পরিমাপক বা অনেকগুলো পরিমাপকের সমষ্টিগত সূচকও ব্যবহার করা যেতে পারে।

মৌসুমী দারিদ্র্য

বাংলাদেশে আয় দারিদ্র্য মাপার জন্য যে জরিপটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় তা বাৎসরিক জরিপ এবং তার নাম "পারিবারিক ব্যয় জরিপ"। এই জরিপ বৎসরের ঠিক কোনসময় চালানো হয়েছে তা জানা কঠিন। ফলে গবেষকরা সমগ্র বৎসরের জন্য ঐ জরিপলব্ধ তথ্যকেই ধ্রুব বলে ধরে নেন। সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ কৃষি নির্ভর এবং কৃষির অবস্থা মৌসুম ভেদে ওঠা নামা করে। সাধারনত: অনটন কর্মসুযোগের ঘাটতি ইত্যাদি লেগেই থাকে। পল্লী অঞ্চলের লোক এই মৌসুমটিকে তাই "মরা কার্তিক" নামে অভিহিত করে থাকেন। পক্ষান্তরে এপ্রিল-জুন মাসগুলোতে বোরো ফসল কাটা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে মানুসের হাতে আয় ও কাজ থাকে। এই সময়কে গ্রামের মানুষ কোথাও কোথাও "নবান্ন" হিসাবে অভিহিত করে থাকে।

স্বভাবত: দেশের দারিদ্র্য অবস্থা বিশেষত: পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার নির্ভর করবে ঠিক কোন সময়ে জরিপ চালানো হচ্ছে তার উপর। "মরা-কার্তিক" জরিপ চালানো হলে আমরা যে দারিদ্র্যের হার পাবো তা স্বভাবত:ই একটু অতিরিক্ত উচ্চ মাত্রার হবে। পক্ষান্তরে নবান্নের সময় পরিমিত দারিদ্র্যের হার একটি অতিরিক্ত নিম্নমাত্রার হবে। ১৯৮৮-৮৯ সালে বেশ কয়েকটি গ্রামে জরিপ চালিয়ে বি.আই.ডি.এস. গবেষকরা দেখেছেন যে বাংলাদেশে "মৌসুমী দারিদ্র্যের" ব্যবধান ছিলঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর = মরা-কার্তিক = ৫১.১ শতাংশ।

এপ্রিল-জুন = নবান্ন = ৩৩ শতাংশ।

দারিদ্র্য আপেক্ষিক ধারনা

বস্তুত: পূর্ববর্তী সমগ্র আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট ভাগে প্রতীয়মান হয়েছে যে "দারিদ্র্য" একটি আপেক্ষিক অবস্থা। প্রত্যেক জনগোষ্ঠী নিজ দেশের স্থান-কাল-পাত্র, গড়-আয়, গড় সম্পদ, গড় প্রাচুর্য ইত্যাদি বিবেচনা করে সামাজিক ভাবে নিজেরাই সিদ্ধান্তে আসেন যে কারা সমাজের মধ্যে

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এবং কারা অপেক্ষাকৃত ধনী। বস্তুত: দরিদ্রদের চিহ্নিত না করে ধনীদের চিহ্নিত করা অসম্ভব। বর্তমানে মূলধারার এবং অপেক্ষাকৃত রক্ষনশীল প্রতিষ্ঠানগুলো "দারিদ্র্যের" আপেক্ষিকতা সম্পর্কে আগের চেয়ে অধিক, সচেতন হয়ে উঠেছেন। অবশ্য এ নিয়ে মতভেদ ও বিতর্ক এখনো অব্যাহত রয়েছে। উদাহরন হিসাবে "বিশ্ব ব্যাংকের" দারিদ্র্য গবেষনার দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। ২০০০ সালের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের World Devlopment Report এর বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয় "দারিদ্র্য"। এই রিপোর্টের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও গবেষনার প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয় অধ্যাপক রবি কানুবুরের উপর। তিনি প্রথমেই স্থির করেন যে "দারিদ্র্য" ধারনাটি দরিদ্ররা কিভাবে মূল্যায়ন করেন সে বিষয়ে সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধান চালানো হবে। এর ফলে ১৯৯০ দশকে পৃথিবীর ৬০টি দেশ থেকে ৬০ হাজার দরিদ্র নারী-পুরুষের নিজস্ব দারিদ্র্য বিষয়ক অভিমত সংগ্রহ করা হয়। এই সংকলিত বিপুল তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক ওয়েব সাইটে যে Page খোলা হয়েছে তার শিরোনাম হচ্ছে "www.world.org/poverty/voice/overview" আমরা উক্ত ওয়েব সাইট থেকে "দারিদ্র্য" সম্পর্কে যে প্রধান চিন্তা দরিদ্রের নিজস্ব সাধারন চিন্তা হিসাবে বেরিয়ে এসেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে তুলে ধরছি:

বর্তমানে মূলধারার এবং অপেক্ষাকৃত রক্ষনশীল প্রতিষ্ঠানগুলো "দারিদ্র্যের" আপেক্ষিকতা সম্পর্কে আগের চেয়ে অধিক, সচেতন হয়ে উঠেছেন।

দারিদ্র্য শুধু আয়ের স্বল্পতা নয়। এটা বহুমাত্রিক প্রত্যয়। আত্মিক শান্তি, সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মুক্ত হতে পারে না।

১. দারিদ্র্য শুধু আয়ের স্বল্পতা নয়। এটা বহুমাত্রিক প্রত্যয়। আত্মিক শান্তি, সুস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি সম্পূর্ণ দারিদ্র্য মুক্ত হতে পারে না। খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, কাজের অভাব, থাকার জায়গার অভাব, ক্ষমতার অভাব, অর্থের অভাব এগুলোর সম্মিলিত নাম হচ্ছে "দারিদ্র্য"।
২. সারা বিশ্বে গত কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের ভেতরে এবং বাইরে এই ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস মোকাবেলার ক্ষমতা দরিদ্রের নাই। দরিদ্ররা মনে করেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ক্রমবর্ধমান সুফল ও সুযোগগুলো তাদেরকে সর্বদাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়।
৩। নারীদের উপর নির্যাতন, বিশেষ ভাবে দরিদ্র নারীদের উপর গৃহের ভেতরে এবং সামাজিক পরিমন্ডলে উভয় ক্ষেত্রেই নির্যাতন ও বৈষম্য বিদ্যমান।
৪। দরিদ্ররা চান যেন সরকার এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাছে আরো বেশি জবাবদিহি করেন। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি প্রধান সমস্যা হিসাবে দরিদ্ররা চিহ্নিত করেছেন।
৫। এন.জি.ও দের সেবাকে দরিদ্ররা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন কিন্তু তারা এন্ড উল্লেখ করেছেন যে অনেক এন.জি.ও-ই বর্তমানে জনগনের কাছে কোন জবাবদিহি করেন না।
৬। দরিদ্ররা মূলত: আত্মীয়-স্বজন এর ঘনিষ্ট বন্ধনীর সাহায্যে নিয়ে টিকে থাকতে চেষ্টা করেন। এখনও অনেক জায়গায়ই তাদের শেষ ভরসাস্থল স্থানীয় ধর্মীয় পবিত্র মানুষ।

বৈপ্লবিক অর্থনীতিক পুনর্গঠনের প্রবক্তরা মনে করেন যে "আয় দারিদ্র্য বা পুষ্টি দারিদ্র্য" নির্ণয়ের অনুশীলনটি অমানবিক এবং একার্থে প্রতিক্রিয়াশীল। তাদের যুক্তি অনুযায়ী এক সময়ে মানুষ যখন আদিম গোত্র বসবাস করতো এবং শিকার ও ফলমূল কুড়িয়ে জীবন যাপন করতো তখন সব মানুষই বর্তমান সংজ্ঞানুযায়ী দরিদ্র ছিল কিন্তু তখন তাদেরকে দরিদ্র বলা অর্থহীন হবে। বর্তমান খোদ আমেরিকাতেও দারিদ্র্য রেখা হিসাব করে যাদেরকে দরিদ্র বলা হয় তাদের অবস্থা বাংলাদেশের অনেক ধনীদের চেয়ে উন্নত, কিন্তু তারপরেও তাদেরকে "দরিদ্র" বলাটার একটা সামাজিক অর্থ অবশ্যই রয়েছে।

বর্তমান খোদ আমেরিকাতেও দারিদ্র্য রেখা হিসাব করে যাদেরকে দরিদ্র বলা হয় তাদের অবস্থা বাংলাদেশের অনেক ধনীদের চেয়ে উন্নত, কিন্তু তারপরেও তাদেরকে "দরিদ্র" বলাটার একটা সামাজিক অর্থ অবশ্যই রয়েছে।

"পুষ্টি দারিদ্র্য" যেভাবে হিসাব করা হয়েছে তাতে মানুষকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে কোন মতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারলেই মানুষ দরিদ্র নয় অর্থাৎ নয় অর্থাৎ মানুষের "শ্রমের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা" কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ ধরনের দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়েছে। বস্তুত: "শ্রমের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা" বজায় রাখাটার পেছনের অভিপ্রায় সম্ভবত: সস্তা শ্রম শোষনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত

আহরন। যেভাবে আমরা দুগ্ধবর্তী গাভীকে খড় ও বিচালী দিয়ে বাঁচিয়ে রাখি, যাতে ভবিষ্যতে সে বেশি দুগ্ধদানে সক্ষম হয়। বিপ্লবী অর্থনীতিবিদরা তাই এ ধরনের ধারনাকে তার চেহারা মূল্যে গ্রহণ করতে রাজী নন। কেউ এমনকি "দারিদ্র্য" ধারনাটিকেই "পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র" হিসাবে অভিহিত করেছেন।

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য একমাত্রিক বা বহুমাত্রিক উভয় প্রকার হতে পারে। ন্যুনতম পুষ্টি বা ন্যুনতম আয় বঞ্চিত ব্যক্তিদের সাধারনত: দরিদ্র বলা হয়। দারিদ্র্য একমাত্রিক পদ্ধতিতে সহজে পরিমেয় কিন্তু এটা অপেক্ষাকৃত বিমূর্ত ও পূর্বনির্ধারিত মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য তথ্যের দিক থেকে ঐশ্বর্যশালী হলেও তা সহজে পরিমেয় এবং তুলনীয় নয়। মৌসুম ভেদে বাংলাদেশে দরিদ্রা ওঠা নামা করে। এছাড়াও চরম দরিদ্র ও দরিদ্রদের মাঝে পার্থক্য করা হয়। দারিদ্র্য ধারনাটি সামগ্রিক বিচারে আপেক্ষিক। তাই দুই দেশের দারিদ্র্যের হার খুব সতর্কতার সঙ্গে তুলনা করা উচিৎ। "দারিদ্র্য ধারনাটিকে তার চেহারা মূল্যে গ্রহণ না করে বিপ্লবী অর্থনীতিবিদরা এর পেছনে "পুজিবাদী মূল্যবোধের" অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. দারিদ্র্য ধারনাটি-

ক. এক-মাত্রিক; খ. বহু-মাত্রিক;

গ. একমাত্রিক ও বহুমাত্রিক।

২. বাংলাদেশে দারিদ্র্য রেখা আয় মাপা হয়-

ক. ন্যুনতম পুঁষ্টি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আয় হিসাব করে;

খ. ন্যুনতম পুঁষ্টি রক্ষার জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয় আয় হিসাব করে;

গ. ন্যুনতম পুঁষ্টি রক্ষার জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয় আয়ের সঙ্গে ৩০ শতাংশ আয় যোগ করে।

৩. বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ হয়-

ক. নবান্নের সময়; খ. এপ্রিল-জুন মাসে;

গ. অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে।

৪. একাধিক দারিদ্র্য আয় রেখার-

ক. পরিমাপের সহজ; খ. তথ্য-বহুল কিন্তু সহজে পরিমেয় নয়;

গ. পরিমাপ সহজ কিন্তু তথ্যবহুল নয়।

৫. দারিদ্র্য ধানাটি কোন কোন বৈপ্লবিক অর্থনীতিবিদদের মতে-

ক. একটি "আপেক্ষিক ধারনা; খ. একটি "পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র;

গ. একটি "প্রগতিশীল" প্রত্যয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. মৌসুমী দারিদ্র বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. বিভিন্ন ধরনের "দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিন।

২। কেন "দারিদ্র্য" অবস্থাকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ তার পক্ষে অন্তত: ৩টি যুক্তি প্রদর্শন করুন।

পাঠ-৮.২ ঃ দারিদ্র্যের হার : গতি-প্রবনতা

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশে মাথা-গণনামুলক দারিদ্র্যের হার কি ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে;
- কমলে কখন কমেছে এবং বাড়লে কখন তা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মাথা-গণনামূলক দারিদ্র্যের হার ছাড়াও কতিপয় অন্যান্য মাত্রার দারিদ্র্যের গতিপ্রবনতা;
- বিবিএস কর্তৃক সদ্যসমাপ্ত সর্বশেষ দারিদ্র্য পরিমাপ ও তাদের মতে দারিদ্র্যের গতি-প্রবনতা।

বি.আই.ডি.এস গবেষকবৃন্দ তথা ড. মাহাবুব হোসেন, জিল্লুর রহমান এবং ড. বিনায়ক সেন বাংলাদেশের মাথা গণনামূলক দারিদ্র্যের হার পরিমাপ করেছেন। তারা ২১১২ ক্যালরি খাদ্যমানের মূল্যের সঙ্গে ৩০ শতাংশ যোগ করে দারিদ্র্য রেখা আয় নির্ণয় করেছেন। এবং পরবর্তীতে "পারিবারিক ব্যয় জরিপ"- এর তথ্য তাদের কাছে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিশেষ বছরের জন্য প্রাপ্তব্য ছিল, সে জন্য তাদের দারিদ হার গণনা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ বছরের জন্য প্রাপ্তব্য ব্যয় জরিপ"-এর তথ্য তাদের কাছে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিশেষ বিশেষ বছরের জন্য প্রাপ্তব্য ছিল, সে জন্য তাদের দারিদ্র্য জার গণনা ১৯৯০ পর্যন্ত সীমিত। তবে তাদের গণনার সুবিধা হচ্ছে একই ধরনের সংজ্ঞা ও উপাত্ত ব্যবহার করে সাম্প্রতিক পর্যায়ে সমগ্র গ্রামীন দারিদ্র্যের হার কালানুক্রমিক ভাবে তারা নির্ণয় করেছেন। তাদের গবেষনা লব্ধ ফলাফল ৮.২ নং সারনীতে তুলে ধরা হল।

সারণী ৮.২ ঃ গ্রামীন দারিদ্র্যের হার: ১৯৬৩/৬৪-১৯৮৯/৯০

বছর	গ্রামীন জনসংখ্যার কত শতাংশ দারিদ্র্য ব্যয় রেখার নিচে অবস্থান করেছেন
১৯৬৩-৬৪	৪৩.৬ শতাংশ
১৯৭৩-৭৪	৭১.৩ শতাংশ
১৯৮১-৮২	৬৫.৪ শতাংশ
১৯৮৩-৮৪	৫০.০ শতাংশ
১৯৮৫-৮৬	৪১.৩ শতাংশ
১৯৮৮-৮৯	৪৩.৮ শতাংশ
১৯৮৯-৯০	৩৭.৫ শতাংশ

(৬২ টি গ্রাম জরিপের ভিত্তিতে)
উৎস: টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট, ভল্যুম ওয়ান, ১৯৯১।

সারণীর দিকে লক্ষ্য করলে তাৎক্ষনিক ভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চোখে ধরা পড়ে:
ক. ১৯৬৩/৬৪ থেকে ১৯৮৯/৯০ পর্যন্ত অর্থাৎ স্বাধীনতার আগে পরে দীর্ঘ ২৫ বছরেও দারিদ্র্যের হার খুব একটা কমেনি। মাত্র ৪৪ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩৮ শতাংশ। আর যেহেতু ১৯৮৮-৮৯ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৩. শতাংশ বা একার্থে বলা যায় যে এই কালপর্বে পল্লী দারিদ্র্য বাংলাদেশে গত ২৫ বছর একই রকম থেকে গিয়েছে। মোটেও হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় নি।
খ। কিন্তু সারণীর শুরুর ও শেষের বছরের তথ্যের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত টানাট সমীচীন নয়। যেহেতু অর্ন্তবর্তীকালীন বছরগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে দারিদ্র্যের হার যথেষ্ট ওঠা নামা করেছে।

সারনীর তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৬৩-৬৪ থেকে১৯৭৩-৭৪ এই অন্তবর্তীকালীন কালপর্বে দারিদ্র্যের হার ৪৩.৬ শতাংশ থেকে নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৭১.৩ শতাংশে উপনীত হয়েছিল। অবশ্য এই নাটকীয় বৃদ্ধির কারণগুলো সহজেই অনুমেয়:

১. এর মধ্যে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে পল্লী অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।
২। এই সময় প্রচন্ড মুদ্রাস্ফীত ঘটে, বিশেষত: চালের দামের কয়েকগুন বৃদ্ধি ঘটে।
৩। ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে খরা -বন্যা ও অবশেষে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করেছিল।
৪। এই সময়ে যেটুকু খাদ্য-শস্য সরকারের হাতে ছিল তা বন্টন ঠিক মত হয় নি।

১৯৬৩-৬৪ থেকে১৯৭৩-৭৪ এই অন্তবর্তীকালীন কালপর্বে দারিদ্র্যের হার ৪৩.৬ শতাংশ থেকে নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৭১.৩ শতাংশে উপনীত হয়েছিল।

যাই হোক উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম কয়েক বছরে দারিদ্র্যের হার নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।
অবশ্য এরপর থেকে দারিদ্র্যের হার আবার কমতে কমতে পুনরায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী স্তরে পৌঁছায় ১৯৮৮-৮৯ সালে। এর পরের বছর দারিদ্র্যের হার আরো নিচে নেমে দাঁড়ায় মাত্র ৩৮ শতাংশ। তবে এই সর্বশেষ নিম্নতম দারিদ্র্যের হার পরিমাপের ভিত্তি হচ্ছে বি.আই.ডি.এস. পরিচালিত নমুনা জরিপ (৬২টি গ্রাম)।

অন্যান্য দারিদ্র্যের সূচকসমূহ

বাংলাদেশের পুষ্টি গবেষকরা গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু পুষ্টিমাত্রার দতিপ্রবনতা পরিমাপ করেছেন। দুটি ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ পরিমাপের কালানুক্রমিক তথ্য বিদ্যমান। একটি হচ্ছে মাথা-পিছু ক্যালরী বা এনার্জি গ্রহণ মাত্রা।

সারণী ৮.৩ : মাথাপিছু পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা (গ্রামাঞ্চলে): ১৯৬২/৬৪ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত

পুষ্টি গ্রহণ মাত্রা	১৯৬২-৬৪	১৯৭৫-৭৬	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৯০
শক্তি (কিলো ক্যালরী)	২৩০১	২০৯৪	১৯৪৩	১৮৬৯	১৮৯২
প্রোটিন (গ্রাম)	৫৭.৯	৫৮.৫	৪৮.৪	৫০.৩	৪৯.২

উৎস: পুষ্টি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববদ্যিালয় পরিচালিত বিভিন্ন সার্ভে রিপোর্ট থেকে সংকলিত।
অপরটি হচ্ছে মাথাপিছু প্রোটিন গ্রহণ মাত্রা। তাদের তথ্যের ভিত্তি পারিবারিক ভোগমাত্রা সংক্রান্ত কালানুক্রমিক নমুনা জরিপ। স্বভাবতই তাদের উপাত্ত সমগ্র জাতীয় ভিত্তিতে সংগৃহীত হয় নাই বলেই মনে হয়। তবু এ ধরনের প্রত্যক্ষ পরিমাপ থেকে "গতিপ্রবনতা" বিষয়ে ধারনা অর্জন সম্ভব। এই কারণে তাদের গবেষনালব্ধ ফলাফল ৮.৩ নং সারণীতে তুলে ধরা হলো।

উপরোক্ত সারণীতে গ্রামাঞ্চলে সকল ধরনের পরবারের গড় পুষ্টিমাত্রার গতি-প্রবনতা তুলে ধরা হয়েছে। স্বভাবতই দরিদ্রের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং গড় পুষ্টি-হ্রাস পেলে, দরিদ্রদের জন্য সেই হ্রাসের পরিমান তুলনামূলকভাবে আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

১৯৬২/৬৪ সাল থেকে ১৯৮২/৮৩ সাল পর্যন্ত সাধারনভাবে গড়ে গ্রামীন লোকদের পষ্টিমাত্রা হ্রাস পেয়েছে।

যাই হোক সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে ১৯৬২/৬৪ সাল থেকে ১৯৮২/৮৩ সাল পর্যন্ত সাধারনভাবে গড়ে গ্রামীন লোকদের পষ্টিমাত্রা হ্রাস পেয়েছে। তবে ১৯৮২-৮৩র পর তা আবার বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের আয় দারিদ্র্যের গতি প্রবনতা বিষয়ক তথ্যাবলীর সঙ্গে এই তথ্যের সাযুজ্য নেই। পরবর্তীতে বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়ও ব্যয় জরিপ থেকে গ্রামাঞ্চলে পুষ্টি

গ্রহণ মাত্রা থেকে জানা যায় ২০১৬ সালে শক্তি গ্রহণ মাত্রা ২২৪০.২ কিলোক্যালরি ও প্রোটিন ৬৩.৩০ গ্রাম।

১৯৭৫/৭৬ সালে ১১ বছরে কম বসয়স্ক শিশুদের মধ্যে "স্বাভাবিক শিশুর" হার ২০ শতাংশ। ১৯৯৫ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৮ শতাংশ।

পুষ্টিবিদরা শিশুদের দৈর্ঘ্য ও ওজন সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে "এ্যানথ্রোপোমেট্রিক" মানের সঙ্গে তুলনা করে "স্বাভাবিক পুষ্টি মান সম্পন্ন" শিশুদের গড় হার নির্নয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। সেসব গবেষনার তথ্য থেকেও দেখা যায় ১১ বছরে কম বসয়স্ক শিশুদের মধ্যে "স্বাভাবিক শিশুর" হার ১৯৭৫/৭৬ সালে ছিল ২০ শতাংশ। ১৯৯০ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৮ শতাংশ। পক্ষান্তরে বর্ষাকৃতি ও ক্ষীনকায় (Stunted and wasted) শিশুর হার ১৯৯৫/৭৬ সালে যেখানে ছিল ১৬ শতাংশ, ১৯৯০ সালে সেখানে তা কমে হয়েছে মাত্র ৬ শতাংশ।

গভীরতর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে আরো লক্ষ্যণীয় যে সকল ধরনের পুষ্টি মানের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মেয়ে শিশুর, ছেলে শিশুদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিকতর বঞ্চিত অবস্থায় রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নমুনাজরিপ ও মাইক্রো-সার্ভের মাধ্যমে লব্ধ তথ্য থেকে বহু-মাত্রিক দারিদ্র্যের হার সম্পর্কে কিছু কিছু পরিমানগত ইংগিত পাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন উৎস থেকে সংকলিত এ ধরনের কিছু ইংগিতমূলক তথ্য নিচে তুলে ধরা হল।

নিরাপদ বিশুদ্ধ পানির সুযোগ ১৯৮১ সালে ভোগ করতেন গ্রামীন ৫৩ শতাংশ জনগন। বর্তমানে অবশ্য বি.আই.ডি.এস জরিপানুসারে এই হারে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে (৮৭ শতাংশ)

ক. ১৯৯০ সালে পরিচালিত এক গ্রামীন জরিপ থেকে (৬২টি গ্রাম) জানা যায় যে গ্রামের ১৭ শতাংশ মানুষের ন্যুনতম দুটি কাপড় নেই (অর্থাৎ দুটি লুংগি বা দুটি শাড়ি নেই)। এবং ২২ শতাংশ গ্রামবাসীর কোন শীতবস্ত্র নেই।

খ. ১৯৮২ সালের বি.বি.এস. জাতীয় জরিপ অনুসারে ৫৪ শতাংশ গ্রামবাসীর জন্য মলত্যাগের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। খোলা জায়গাতেই তাদের এসব কাজ সরাতে হতো। অবশ্য বি.বি.এস একই ধরনের জরিপ ১৯৮৯-৯০ সালে চালিয়ে দেখতে পায় সে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে অর্থাৎ তখন ৪৪ শতাংশ গ্রামবাসীর জন্য মলমূত্র ত্যাগের সুবন্দোবস্ত ছিল না।

গ. নিরাপদ বিশুদ্ধ পানির সুযোগ ১৯৮১ সালে ভোগ করতেন গ্রামীন ৫৩ শতাংশ জনগন। বর্তমানে অবশ্য বি.আই.ডি.এস জরিপানুসারে এই হারের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে (৮৭ শতাংশ)।

ঘ. সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালের সেবা নেয়ার সুযোগ রয়েছে এরকম গ্রামবাসীর সংখ্যা ১২ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ। বাকীরা সেবাহীন থাকেন অথবা বেসরকারী উৎস থেকে সেবা ক্রয় করেন।

ভূমিহীন ও কার্যত: ভূমিহীণ পরিবাগুলো গড় ঘাটতি মাসের সংখ্যা বছরে ৪ মাস। আর প্রান্তিক চাহীদার গড় ঘাটতি মাসের সংখ্যা হচ্ছে বছরে ৩ মাস।

ঙ. যে বয়সে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা সেই বয়সযুক্ত শিশুদের মাত্র ৫২ শতাংশ ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পেত। অবশ্য ১৯৯০ সাল নাগাদ এই অনুপাত বেশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৮ শতাংশ।

চ. বি.আই.ডি.এস. গ্রাম জরিপের তথ্য থেকে যায় যে গ্রামে ৬৮ শতাংশ পরিবার হাল্কা মওসুমে ঘাটতির সম্মুখীন হন অর্থাৎ এই ঘাটতি ন্যুনধিক ২ মাস স্থায়ী হয়। আর ৬ শতাংশ পরিবার সার বছরই ঘাটতি বাজেট নিয়ে সংসার চালান। বিশেষত: ভূমিহীন ও কার্যত: ভূমিহীন পরিবারগুলো গড় ঘাটতি মাসের সংখ্যা বছরে ৪ মাস। আর প্রান্তিক চাষীদের গড় ঘাটতি মাসের সংখ্যা হচ্ছে বছরে ৩ মাস।

বিবিএস ঃ সর্বশেষ দারিদ্র্য অবস্থা

১৯৯৮ সালে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ মিশন "1998 Bangladesh Poverty Assessment" নামে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন সেখানে দু-ধরনের দারিদ্র্য পরিমাপের কালানুক্রমিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চরম দারিদ্র্য আয় মাপা হয়েছে ২১২২ ক্যালরী খাদ্যের মূল্য দ্বারা এবং তার সঙ্গে অন্যান্য মৌলিক চাহিদার অর্থমূল্য যোগ করে "দারিদ্র্য" আয় রেখা (বা বিশ্বব্যাংকের ভাষায় নিম্ন দারিদ্র্য

রেখা এবং উচ্চ দারিদ্র্য রেখা) স্থির করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের পরিমিত দারিদ্র্য প্রবনতা তিনটি স্তরে করা হয়েছে গ্রামে, শহরে এবং জাতীয় পর্যায়ে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয় ও ব্যয় জরিপকৃত তথ্য আমরা ৮.৪ নং সারণীতে তুলে ধরলাম।

সারণী ৮.৪ ঃ সারিদ্র্যের গতি প্রবনতা: বিবিএস ষ্টাডি

	চরম দারিদ্র্য (নিম্নতর দারিদ্র্য রেখা)						দারিদ্র (উচ্চতর দারিদ্র্য রেখা)				
	১৯৯৫-৯৬	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬		১৯৯৫-৯৬	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
জাতীয়	৩৫.২	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৯		৫০.১	৪৮.৯	৪০.০	৩১.৫	২৪.৩
গ্রামীন	৩৯.৫	৩৯.৫	২৮.৬	২১.১	১৪.৯		৫৪.৫	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২	২৬.৪
শহর	১৩.৭	১৩.৭	১৪.৬	৭.৭	৭.৬		২৭.৮	৩৫.২	২৮.৪	২১.৩	১৮.৯

উৎস্য : HIES(2016), BBS

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে:

ক. ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের দারিদ্র্য (চরম এবং অচরম দারিদ্র্য উভয়ই) এবং শহর দারিদ্র্য উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। এসময় গ্রামীণ দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য পরিমান হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে যে সমস্ত গবেষনা পরিচালিত হয়েছিল বিশেষত ঃ ৮০ এর দশকে বিশ্বব্যাংকের তৎকালীন হিসাব অনুযায়ী দারিদ্র্য অবস্থার বেশ অবনতি হয়েছিল। পরবর্তীতে ৯০ দশকে বিশ্বব্যাংক ও বি আই ডি এস উভয়ের তথ্যই প্রমাণ করে যে দারিদ্র্য অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে (২০১৮ সালে প্রাক্কলিত) দারিদ্র্য ২১.৮ ও চরম দারিদ্র্য ১১.৩।

৮০-র দশকে বিশ্বব্যাংকের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী দারিদ্র্য অবস্থার অবশ্যই অবনতি হয়েছিল। তবে ৯০ দশকে বিশ্বব্যাংক ও বি.আই.ডি.এস উভয়ের তথ্যই প্রমান করছে যে দারিদ্র্য অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

খ. বিবিএস তথ্যচিত্র আরেকটি বিষয় তুলে ধরেছে। তা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের মাত্রা শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশি এবং সবসময়ই তা সত্য।

সারসংক্ষেপ

বি.আই.ডি.এস. গবেষকবৃন্দ এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ দারিদ্র্য বিষয়ক গবেষণা থেকে বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে ও পরে মাথা-গণনামূলক দারিদ্র্যের হারের গতিপ্রবনতা সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জন সম্ভব। সাধারনভাবে তাদের গবেষনালব্ধ ফলাফল হচ্ছে বাংলাদেশে ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত মাথা গণনামূলক দারিদ্র্যের হার খুবই বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়। ১৯৭৩/৭৪-এর পর তা পুনরায় হ্রাস পেয়ে ১৯৮৮/৮৯ নাগাদ তা পুনরায় ১৯৬৩-৬৪ সালের পর্যায়ে পৌঁছায়। অবশ্য বিশ্বব্যাংকের হিসাবানুসারে ৮০-র দশকে দারিদ্র্যের হার কমবেশি উর্ধ্বগামী ছিল। তবে ১৯৯০-এর দশকে নিশ্চিতভাবে দারিদ্র্যের হার ছিল নিম্নগামী। এই সমগ্র কালপর্বে সর্বদাই গ্রামীন দারিদ্র্যের হার ছিল শহরের দারিদ্র্যের হারের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বেশি। বর্তমানে সর্বশেষ হিসাবানুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক লোক দরিদ্র এবং এক তৃতীয়াংশ লোক চরম দরিদ্র্য। দারিদ্র্যের অন্যান্য নানা সূচক থেকেও লক্ষ্য করা যায় যে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুর পুষ্টি ঘাটতি, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির বস্ত্র ঘাটতি, পয়:প্রাণালীর সুযোগের অভাব, স্বাস্থ্য সেবার অভাব ও আয়-ব্যয় ঘাটতি রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা সংস্থা বা বি.আই.ডি.এস গবেষনায় দেখা গিয়েছে যে ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত কালপর্বে বাংলাদেশে-

ক. দারিদ্র্যের হার অপরিবর্তিত ছিল;

খ. দারিদ্র্যের হার প্রথমে বৃদ্ধি পেয়ে পরে হ্রাস পেয়েছে;

গ. দারিদ্র্যের হার প্রথমে বৃদ্ধি পেয়ে আবার প্রায় একই পর্যায়ে নেমে এসেছে।

২. বিশ্বব্যাংকের গবেষনায় দেখা যায় যে বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্যের হার-

ক. ৮০-র দশকে বৃদ্ধি পেলেও ৯০-র দশকে হ্রাস পেয়েছে;

খ. ৮০-র দশকে বৃদ্ধি পেলেও ৯০-র দশকে হ্রাস পায় নি;

গ. ৮০ ও ৯০ এই উভয় দশকেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. সাধারণভাবে বাংলাদেশ সর্বদাই শহরের দারিদ্র্যের হার গ্রামের দারিদ্র্যের হারের তুলনায়-

ক. কম; খ. বেশি;

গ. সমান।

৪. ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে "চরম দারিদ্র্যের হার" এবং সাধারন "দারিদ্র্যের হার" ছিল যথাক্রমে-

ক. ৫৩.০৮ শতাংশ এবং ৩৫.৫৫ শতাংশ;

খ. ৩৫.৫৫ শতাংশ এবং ৫৩.০৮ শতাংশ;

গ. ২৫ শতাংশ এবং শতাংশ।

৫. বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশুদের ভর্তির হার ৯০-র দশকে-

ক. সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে; খ. বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে;

গ. খুব একটা বৃদ্ধি পায় নি।

৬. বাংলাদেশে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার সাম্প্রতি-

ক. সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে; খ. বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে;

গ. খুব একটা বৃদ্ধি পায় নি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. "১৯৭৩-৭৪ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল সর্বাধিক"-ব্যাখ্যা করুন?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. দারিদ্র্যের বিভিন্ন সূচকগুলো কি এবং সেই সূচকানুযায়ী বাংলাদেশের জনগেনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনার মাত্রা কতটুকু তার একটি তালিকা প্রনয়ন করুন।

২। কেন গ্রামে শহরের তুলনায় দারিদ্র্য বেশি হয়, বিশেষত: হাল্কা মওসুমে সে বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

পাঠ-৮.৩ ঃ আপেক্ষিক দারিদ্র্য : আয়, সম্পদ ও সুযোগের বৈষম্য

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- চূড়ান্ত বঞ্চনা এবং আপেক্ষিক বৈষম্যের মধ্যে পার্থক্য কি;
- বাংলাদেশের জাতীয়, শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাধীনতার আগে ও পরে আয় এর ক্ষেত্রে ও ভোগ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বৈষম্যের পরিমান কি ছিল এবং কিভাবে তা পরিচর্তিত হয়েছে;
- আঞ্চলিক আপেক্ষিক বৈষম্য তথা শহর বনাম গ্রামের বৈষম্যের নানা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ হিসাব;
- বাংলাদেশের নারী -পুরুষে বিরাজমান বৈষম্যের বিভিন্ন দিক।

আপেক্ষিক বৈষম্য ও চূড়ান্ত বঞ্চনার পার্থক্য

আমরা যখন ন্যুনতম পুষ্টি মাত্রাকে একটি দ্রুব মান ধরে নিয়ে বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্যের হার একই আয়-রেখার মাধ্যমে মাপার প্রযাস পাই তখন একে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে "চুড়ান্ত বঞ্চনার" মাত্রা পরিমাপক হিসাবে অভিহিত করা যায়। আমরা তখন সমস্ত সমাজকে নিছক দুটি গুণগত স্তরে ভাগ করে দেখতে চাই কারা দরিদ্র, কারা দরিদ্র নয়। অনুরূপ ভাবে আমরা দেখতে চাইতে পারি কারা বস্ত্রহীন, কারা বঞ্চিত নয় ইত্যাদি। এই ধরনের দ্বি-ভাজন ভিত্তিক বৈষম্যকে "চুড়ান্ত বঞ্চনা" বা কখনো কখনো Absolute Inequlity হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আরেক ধরনের তথ্যও আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারি। যেমন ধরুন দরিদ্রদের মধ্যেই কে দরিদ্র রেখার কতটুকু নিচে আছে বাধনীদের মধ্যে কার আয় কত বেশি ইত্যাদি তুলনামূলক তথ্যেরও মূল্য রয়েছে। ধরা যাক একটি সমাজের এই সমাজে "চরম বঞ্চনা" রয়েছে। উত্তর হবে না। কিন্তু এই সমাজে কি আপেক্ষিক বৈষম্য বঞ্চনা আছে? উত্তর "না" নাও হতে পারের। নির্ভর করবে ধনীদের মধ্যে আয়ের পার্থক্য আছে কি না? তার উপরে। অনুরূপ ভাবে একটি সমাজের সকলের আয় যদি সমাজে "চরম বঞ্চনা" রয়েছে। কিন্তু সে সমাজে সকল দরিদ্র লোকের আয় যদি পরস্পর সমান হয়, তাহলে আমরা বলবো ঐ সমাজে আপেক্ষিক বৈষম্য বা বঞ্চনা শূন্য। সুতরাং "চরম বঞ্চনা/বৈষম্য" (Absolute Inequlity)বেশি হলেও "আপেক্ষিক বঞ্চনা?বৈষম্য" কম হতে পারে। উদাহরন বাংলাদেশে "চরম বঞ্চনার" মধ্যে তুলনামূলকভাবে আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে আপেক্ষিক বৈষম্য আমেরিকার তুলনায় কম।

> "চরম বঞ্চনা/বৈষম্য" কম হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে আমেরিকান সমাজে "চরম বঞ্চনার" মাত্রা অনেক কম। কিন্তু বাংলাদেশে "চরম বঞ্চনার" মাত্রা তুলনামূলক ভাবে আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে আপেক্ষিক বৈষম্য আমেরিকার তুলনায় কম।

আপেক্ষিক আয় বৈষম্য ঃ গতি প্রবণতা

বাংলাদেশে আয়-বন্টন ক্রমশ: আরো সুষম হয়েছে না কি আয়-বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এ নিয়ে যদি আমরা ভাবতে চাই তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের আয় বন্টনের আপেক্ষিক বৈষম্য কিভাবে মাপা হয় তা আগে নির্ধারন করতে হবে। সাধারনত: অর্থনীতিবিদরা কোন দেশের আয় বন্টনকে "লরেঞ্জ রেখার" সাহায্যে বর্ণনা করে থাকেন এবং এই রেখার ভেতরের দিকের ক্ষেত্রফলকে সমগ্র চতুর্ভূজের অর্ধেকের ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করে যে সহগটি পাওয়া যায় তাকে "গিনি সহগ" বলা

যে দেশের আয় বন্টনের গিনি সহগ হতে বড় সে দেশের আপেক্ষিক আয় বৈষম্য তত বেশি হিসাবে ধরা হয়।

হয়। যে দেশের আয় বন্টনের গিনি সহগ যত বড় সে দেশের আপেক্ষিক আয় বৈষম্য তত বেশি হিসাবে ধরা দেশের আয় বন্টনের গিনি সহগ যত বড় সে দেশের আপেক্ষিক আয় বৈষম্য তত বেশি হিসাবে ধরা হয়। নিচের চিত্রে এর একটি সহজ সরল ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল।

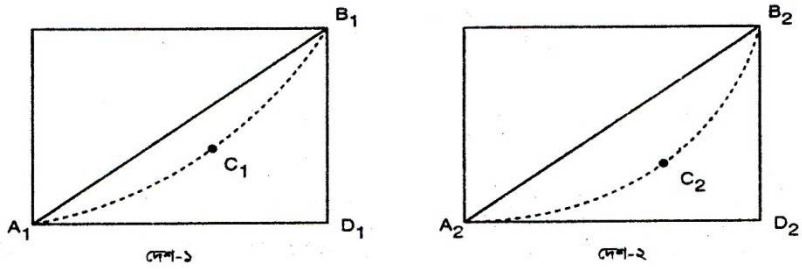

দেশ-১ এর গিনি সহগ = $\frac{A_1B_1C_1}{A_1B_1D_1}$ দেশ-২ এর গিনি সহগ = $\frac{A_2B_2C_2}{A_2B_2D_2}$

দেশ ১ এর গিনি সহগ < দেশ ২ এর গিনি সহগ

উপরের চিত্র থেকে বোঝা যায় যে "গিনি সহগের" সাহায্যে বিভিন্ন দেশের "আপেক্ষিক আয় বৈষম্য" তুলনা করা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা যদি বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন বছরের "গিনি সহগ" নির্ণয় করতে সক্ষম হই তাহলে বাংলাদেশে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে "আপেক্ষিক আয় বৈষম্য" বৃদ্ধি পেয়েছে না হ্রাস পেয়েছে সেটিও সহজেই অনুমান করতে পারবো।

ড. মাহবুব হোসেন ও এ আর খান ১৯৬৩-৬৪, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৮১-৮২ এবং ১৯৮৩-৮৪ সারের জন্য গ্রামীন, শহরের এবং জাতীয় পর্যায়ের পরস্পর তুলনীয় "গিনি সহগ" নির্ণয় করেছেন। তাদের প্রাপ্ত ফলাফল ৮.৫ নং সারণীতে তুলে ধরা হলো।

সারনী ৮.৫ ঃ গিনি সহগ

এলাকা	১৯৬৩-৬৪	১৯৭৩-৭৪	১৯৮১-৮২	১৯৮৩-৮৪
শহর	.৪১	.৩৮	.৪১	.৩৭
গ্রাম	.৩৩	.৩৬	.৩৬	.৩৫
জাতীয়	.৩৬	.৩৬	.৩৯	.৩৫

উৎস: ড. মাহাবুব হোসেন ও এ আর খান, প্রাগুক্ত, ১৯৮৯।

উপরোক্ত সারণী থেকে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়:

ক. বাংলাদেশের আপেক্ষিক আয় বৈষম্য ১৯৯০ পর্যন্ত উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের তুলনায় নিচেই ছিল। এমন কি ভারতের চেয়েও তা নিচে।

খ. সমগ্র ৮০-র দশকে গ্রামীন আয় বৈষম্য .৩৩ থেকে .৩৬ শহরের আয় বৈষম্য .৩৭ থেকে .৪১ এর মধ্যে ওঠা নামা করেছে। স্বভাবতই বলা যায় যে বাংলাদেশের শহরে আপেক্ষিক আয় বৈষম্য গ্রামের চেয়ে বেশি (যদিও আগের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে বাংলাদেশের গ্রামে চরম দারিদ্র্য শহরের তুলনায় বেশি)।

গ. বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে আপেক্ষিক আয় বৈষম্য ১৯৬৩-৬৪-১৯৮৩/৮৪ এই বিশ বছরে মোটামুটি অপরিবর্তিতই ছিল।

"গিনি সহগ" একটি বিমূর্ত সংখ্যা। সুতরাং এ থেকে আয় বৈষম্যের গতিপ্রবনতা সাধারন মানুষের কাছে সহজ বোধ্য হয় না। তাই আরেক ভাবেও আমরা আয়-বৈষম্যের তথ্য উত্থাপন করতে পারি। যেমন; বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে মোট আয়ের কত শতাংশ জমা হচ্ছে। এ ধরনের তথ্যকে অনেক সময় "কেন্দ্রীভবনের হার" বা "Concentration Ratio" বলা হয়।

উদাহরন হিসাবে বলা যায় যে গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে ১৯৭৩/৭৪ সালে গ্রামের মোট আয়ের ২৬.৪ শতাংশ জমা হতো। ১৯৮১/৮২ তে তা সামান্যই বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬.৭ শতাংশ।

গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে ১৯৭৩/৭৪ সালে গ্রামের মোট আয়ের ২৬.৪ শতাংশ জমা হতো। ১৯৮১/৮২ তে তা সামান্যই বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬.৭ শতাংশ।

পক্ষান্তরে শহরের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে শহরের আয়ের ২৯.২ শতাংশ জমা হতো ১৯৭৩/৭৪ সালে। ১৯৮১/৮২ তে তা বেশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩২.১ শতাংশ।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে যে সব আয় জরিপের ভিত্তিতে এসব "আপেক্ষিক বৈষম্যের" পরিমাপ করা হয়েছে তা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। এরা নির্ভারযোগ্য না হওয়ার পেছনে কারনগুলো হচ্ছে:

ক. আমাদের দেশে ধনীরা সর্বদাই প্রকৃত আয় গোপন রাখেন এবং কম করে তা প্রকাশ করেন।
খ. ধনী পরিবারগুলোতে অসংখ্য আশ্রিত ভৃত্য-পরিজন ইত্যাদি থাকে যারা পারিবারিক আয়ে সমানুপাতিক অংশ ভোগ করেন না।
গ. পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষ মহিলারা প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই পুরুষদের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বঞ্চিত থাকেন।

৯০ দশকে গিনি সহগের গতিপ্রবনতা ঃ ভোগ-ব্যয়

বিশ্ব ব্যাংকের সর্বশেষ দারিদ্র্য গবেষণা রিপোর্ট পারিবারিক ব্যয় জরিপের ভিত্তিতে ভোগ-ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে আপেক্ষিক বৈষম্য তার গতি-প্রবণতা বিশ্লেষন করা হয়েছে। স্বভাবতই আয় বৈষম্য থেকেই ভোগ বৈষম্যের উদ্ভব হয়। তবে দুটির সংখ্যা মান সমান হবে না। তবে গবেষনালব্দ ফলাফল ৮.৬ নং সারণীতে তুলে ধরা হল।

১৯৯১/৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত আপেক্ষিক আয় বৈষম্য জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই বৃদ্ধিতে প্রধান অবদান রেখেছে শহরের ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক ভোগ ব্যয় বৈষম্য। উন্নতি হয়েছে।

উক্ত তালিকার প্রধান ফলাফলগুলো হচ্ছে:

ক. ১৯৮৩/৮৪ থেকে ১৯৯১-৯২ পর্যন্ত "গিনি সূচক" খুব পরিবর্তিত হয় নি। এ কথা জাতীয় শহর এবং গ্রাম সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

খ. ১৯৯১/৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত আপেক্ষিক আয় বৈষম্য জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এই বৃদ্ধিতে প্রধান অবদান রেখেছে শহরের ক্রমবর্ধমান আপেক্ষিক ভোগ ব্যয় বৈষম্য।

সারণী ৮.৬ ঃ গিনি সহগ: ভোগ ব্যয় বৈষম্য ১৯৮৩-৮৪ থেকে ১৯৯৫-৯৬

এলাকা	নিম্নতর দারিদ্র্য আয় রেখার দ্বারা নর্মালাইজেশন সাপেক্ষে						উচ্চতর দারিদ্র্য আয় রেখার দ্বারা নর্মালাইজেশন সাপেক্ষ				
	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৮/৮৯	১৯৯১/৯২	১৯৯৫/৯৬		১৯৮৩/৮৪	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৮/৮৯	১৯৯১/৯২	১৯৯৫/৯৬
জাতীয়	২৫.৫৩	২৫.৬৬	২৭.৯৪	২৭.১৫	৩১.০১		২৫.৩৮	২৪.৭৩	২৭.০২	২৪.৯২	২৯.৩৪
শহর	২৯.৪৬	২৯.৮৭	৩১.৭৮	৩১.০৯	৩৬.০৩		২৯.৩১	২৯.৩৪	৩১.৩৫	৩.০৬৮	৩৫.২৮
গ্রাম	২৪.৩৩	২৩.৮০	২৫.৯৬	২৫.০৬	২৬.৪৩		২৯.৩১	২৯.৩৪	৩১.৩৫	৩.০৬৮	৩৫.২৮

উৎস বিশ্বব্যাংক, ১৯৯৮।

বাংলাদেশে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বৈষম্য বিদ্যমান। একটি হচ্ছে আঞ্চলিক বৈষম্য। বিশেষত: শহর ও গ্রামের মধ্যে আয় ও সম্পদের বৈষম্য। অপরটি সমগ্র সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষে বৈষম্য।

গ. ১৯৯৫/৯৬ সালের পরিমাপ অনুযায়ী আপেক্ষিক ভোগ -ব্যয় বৈষম্যের গিনি সহগ জাতীয় পর্যায়ে ছিল ৩১.০১ (নিম্নতর দারিদ্র্য আয় রেখার দ্বারা নর্মালাইজেশন সাপেক্ষে) এবং একই সময়ে একই পদ্ধতিতে পরিমিত একই গিনি সহগ শহর এবং গ্রামের ছিল যথাক্রমে ৩৬.০৩ ও ২৬.৪৩।
একবিংশ শতাব্দীতে এসে খানা আয় ও ব্যয় জরিপ থেকে আমরা জানতে পারি, সবচেয়ে ধনী শতাংশ পরিবারের হাতে ২০১০ সালে গ্রামে মোট আয়ের ২২.৯৩ শতাংশ জমা হতো ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৪.২৫ শতাংশ।
পক্ষান্তরে শহরের সবচেয়ে ৫ শতাংশ পরিবারের হাতে শহরের আয়ের ২৩.৯৩ শতাংশ জমা হতো ২০১০ সালে। ২০১৬ তে তা বেশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৩২.১২ শতাংশ।

গ্রাম-শহর বৈষম্য এবং নারী-পুরুষে বৈষম্য

বাংলাদেশে আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বৈষম্য বিদ্যমান। একটি হচ্ছে আঞ্চলিক বৈষম্য। বিশেষত: শহর ও গ্রামের মধ্যে আয় ও সম্পদের বৈষম্য। অপরটি সমগ্র সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষে বৈষম্য।

শহর-গ্রামের বৈষম্যটি বহু আগে থেকেই চলে আসছে। আমরা যদি শহরবাসীর গড় আয়ের সঙ্গে পল্লীবাসীর গড় আয়ের তুলনা করি তাহলেই বিষয়টি সুষ্ঠু হয়ে পড়বে। ১৯৬৩-৬৪ সালের হিসাবানুসারে বাংলাদেশের পল্লীবাসীর গড় আয় শহরবাসীর গড় আয়ের ৭১ শতাংশের সমান ছিল। পরবর্তীতে এই বৈষম্য বাড়তে থাকে। ১৯৮১-৮২তে এসে দেখা যায় যে গ্রামীন গড় পারিবারিক আয়, শহরের গড় পারিবারিক আয়ের মাত্র ৫৪ শতাংশের সমান। (দ্র:ড. মাহবুব হোসেন ও এ. আর খান)।

১৯৮১-৮২তে এসে দেখা যায় যে গ্রামীন গড় পারিবারিক আয়, শহরের গড় পারিবারিক আয়ের মাত্র ৫৪ শতাংশের সমান।

দুর্ভাগ্যক্রমে পরবর্তী বছরের জন্য আমাদের কাছে গ্রামীন ও শহরের গড় পারিবারিক আয়ের তথ্য নেই। কিন্তু ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর কতিপয় নমুনা জরিপ থেকে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ১৯৯১ সালে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। যেমন:

ক. শহরে বসবাসকারী পরিবার সমূহের মাত্র ১৩ শতাংশ কোন উপযুক্ত পয়:প্রনালী ছাড়াই মল মূত্র ত্যাগ করে থাকেন। গ্রামে এই অনুপাতটি শতকরা ৪০ ভাগ।

খ. শহরে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবারের আপেক্ষিক অনুপাত হচ্ছে ৬৩ শতাংশ। গ্রামে তা মাত্র ৯ শতাংশ।

গ. শহরে মাথা পিছু শোবার ঘরের স্থানের পরিমান হচ্ছে ৬২ বর্গফুট। গ্রামে এই পরিমাপটি হচ্ছে মাত্র ৫৪ বর্গফুট।

(উৎস: আদমশুমারী (নমুনা জরিপ) ১৯৯১, বি.বি.এস)

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশ পিছিয়ে রয়েছেন। জন্মকালিন আয়ু প্রত্যাশা মহিলাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে গড় ৫৮.৬ বছর (১৯৯৬ সালের তথ্য), পক্ষান্তরে পুরুষদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ৫৯.১ বছর

বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচন গবেষণায় নারী-পুরুষের বঞ্চনার মাত্রার ক্ষেত্রে যে আপেক্ষিক বৈষম্য রয়েছে তা নানাভাবে হিসাব করে নির্ণয় করার প্রায় লক্ষ্য করা যায়। তাদের গবেষনায় দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলে নারীপ্রধান খানাগুলোর "চরম দারিদ্র্যের" অনুপাত ৪৫ শতাংশ। পক্ষান্তরে পুরুষ প্রধান খানাগুলোর ৩৯ শতাংশ খানা চরম দারিদ্র্য আয় রেখার নিচে অবস্থান করেন। অবশ্য শহরের পরিবারগুলোর মধ্যে অনুরূপ কোন বেষম্য লক্ষ্য করা যায় না।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশ খানিক টা উন্নত করেছে। প্রত্যাশিত আয়ুস্কাল মহিলাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে গড়ে ৭১.৬ বছর (২০১৮ সালের

তথ্য)। পুরুষ শিশুদের মৃত্যুতে হার ও মেয়ে শিশুদের মৃত্যুতে হারের অনুপাত হচ্ছে ১.৩৩। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুদের সংখ্যাটি বেশ সম্মানজনক। এছাড়া বাংলাদেশে মহিলারা বিপুল সংখ্যায় শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছেন। আয় করেছেন (বিশেষত: তৈরী পোশাক শিল্প ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ভিত্তিক প্রকল্পে), তবু সামাজি মূল্যবোধ এখনও তাদের অনুকুলে পরিবর্তিত হয় নি।

১৯৯৫-৯৬ সালের পারিবারিক আয় জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে হিসাব করে বিশ্বব্যাংক গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, ২৩৯ টি গ্রামের মধ্যে প্রায় ১৭ শতাংশ গ্রামে অধিকাংশ পুরুষ মহিলাদের আয় উপার্জনের বিরুদ্ধে। আরো প্রায় ৩০ শতাংশ গ্রামে পুরষদের মদ্যে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত মোটামুটি বিভক্তক। মাত্র ৪৩ শতাংশ গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ দৃঢ়ভাবে বা সাধারন ভাবে মেয়েদের রোজাগারকে সমর্থন জানিয়েছেন। অবশ্য পরিবার পরিবকল্পনা বা নারী শিক্ষার পক্ষে দৃঢ়ভাবে বা সাধারনভাবে রাজী এরকম গ্রামের অনুপাত হচ্ছে যথাক্রমে ৫৭ শতাংশ এবং ৫৮ শতাংশ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ১৯৬৩/৬৪ থেকে ১৯৮৩/৮৪ এই বিশ বছরে আপেক্ষিক আয় বৈষম্য খুব একটা বাড়েওনি। আন্তর্জাতিক তুলনায় এও লক্ষ্যনীয় যে বাংলাদেশের আয় বন্টনের গিনি সহগটি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশ নিচু। তবে ৯০ দশকে বাংলাদেশের আয় বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে শহরাঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল আয় বৈষম্যের দ্বারা। বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের মধ্যেও আয় বৈষম্য বিদ্যমান। নারী-পুরুষের মধ্যেও আয়-দারিদ্র্য-শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সুযোগ সুবিধার প্রচুর তারতম্য বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশে আপেক্ষিক আয়-বৈষম্য সাধারনভাবে গ্রামের চেয়ে শহরে-
   ক. বেশি; খ. কম;
   গ. সমান।

২. ১৯৯০ এর দশকের আগে বাংলাদেশের আপেক্ষিক আয় বৈষম্য-
   ক. অপরিবর্তিত ছিল; খ. প্রায় অপরিবর্তিত ছিল;
   গ. দ্রুত বাড়ছিল। ঘ. দ্রুত কমছিল।

৩. ১৯৯০ দশকে বাংলাদেশের আপেক্ষিক আয় বৈষম্য-
   ক. অপরিবর্তিত ছিল; খ. প্রায় অপরিবর্তিত ছিল;
   গ. দ্রুত বাড়ছিল; ঘ. দ্রুত কমছিল।

৪. বাংলাদেশের আপেক্ষিক আয় বৈষম্য মাপার জন্য ব্যবহার করা হয়-
   ক. মূল্য সূচক; খ. গিনি সহগ;
   গ. আয় সূচক।

৫. বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবারের আপেক্ষিক অনুপাত হচ্ছে-
   ক. ২৫ শতাংশের নিচে; খ. ১০ শতাংশের নিচে;
   গ. ০৫ শতাংশের নিচে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. "গিনি সহগ" কি? কিভাবে তা মাপা হয় এবং কি কাজে তা ব্যবহৃত হয়।
২. নব্বই দশকে বাংলাদেশে আপেক্ষিক আয় বৈষম্যের গতিপ্রবণতা কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. আপেক্ষিক আয় বৈষম্য বেশি হলেও চূড়ান্ত বঞ্চনা কম হতে পরে" উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
২। বাংলাদেশে নারী -পুরুষে বিরাজমান বৈষম্যের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলো চিহ্নিত করুন ।

পাঠ-৮.৪ ঃ আপেক্ষিক দারিদ্র্য : আয়, সম্পদ ও সুযোগের বৈষম্য

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- চূড়ান্ত বঞ্চনা এবং আপেক্ষিক বৈষম্যের মধ্যে পার্থক্য কি;
- বাংলাদেশের জাতীয়, শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্বাধীনতার আগে ও পরে আয় এর ক্ষেত্রে ও ভোগ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বৈষম্যের পরিমান কি ছিল এবং কিভাবে তা পরিচর্তিত হয়েছে;
- আঞ্চলিক আপেক্ষিক বৈষম্য তথা শহর বনাম গ্রামের বৈষম্যের নানা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ হিসাব;
- বাংলাদেশের নারী -পুরুষে বিরাজমান বৈষম্যের বিভিন্ন দিক।

দারিদ্র্যের কারণ

একজন মানুষ সমাজে দরিদ্রের পংক্তিভূক্ত হয় কেন? কেনই বা আরেকজন মানুষ ধনীদের পংক্তিভূক্ত হয় বা অন্তত: দরিদ্র হয় না? কি ভাবে একজন দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্য সীমার আয়ের উপর উঠে যেতে পারে এবং কি ভাবে একজন মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপর থেকে দারিদ্র্য সীমার নিচের দিকে নেমে যায়? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর জানা না থাকলে আমরা দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ জানতে পারবে না।

এই ঘটনাগুলোর পিছনে নানা ধরনের কারণ কাজ করছে এবং হয় তো এক এক দরিদ্র মানুষের ইতিহাস একেক রকম হবে। কিন্তু তরপরেও আমর যদি বিশ্লেষনকে অর্থবহ ও আয়ত্ত্বের মধ্যে রাকতে চাই তাহলে দারিদ্র্যের জন্য দায়ী কারণগুলোকে প্রধানত: দুটি ধরনের বিভক্ত করা যায়। যেমন: ক) কাঠামোগত কারণ বা বিষয়গত কারণ এবং খ) নীতিগত কারণ বা বিষয়ীগত কারন।
কাঠামোগত বা বিষয়গত কারণগুলো হচ্ছে ইচ্ছা নিরপেক্ষ কারণ। এগুলোর শেকড় সমাজের ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত। এগুলো আমরা সহসা রাতারাতি বদলাতে পারবো না। কিন্তু দৃঢ় ইচ্ছা ও সঠিক নীতি অনুসৃত হলে এগুলো ধীরে ধীরে অতিক্রম করা সম্ভব। উন্নয়নশীল বহুদেশেই যেখানে দারিদ্র্য দূরীকরনের প্রক্রিয়া সফল হয়েছে সেখানে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন, দ:কোরিয়ার কথা উল্লেখ করতে পারি। এ ছাড়া চীনের দৃষ্টান্ত তো রয়েছেই।

নীতিগত বা বিষয়ীগত কারণগুলো মেষ বিচারে নির্ভর করে ক্ষমতা কাঠামোর শীর্ষে অবস্থানকারী শ্রেণী ও সরকারের নীতি ও অভিপ্সার উপর। তারা যদি বিপরীতমুখী নীতি গ্রহণ করেন বা অসংগতিপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেন তাহলে দারিদ্র্য যত দ্রুত কমার কথা তত দ্রুত নাও কমতে পারে এমনকি অবস্থা বিশেষে তা আরো বাড়তেও পারে।

আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা এই দুই ধরনের কারণের সুনির্দিষ্ট রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো যে শহরাঞ্চলে দারিদ্র্য না কমার পেছনে কতকগুলো নীতিগত ভ্রান্তি বিদ্যমান। এরপর গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য আলোচনার সময় দেখানো হবে যে যেখানে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী। অবশ্য এ কথা মনে রাখা উচিত যে কাঠামোগত কারণগুলো দূর না করেও আংশিক দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব। কিন্তু তা অনিশ্চিত এবং সময় সাপেক্ষ। তদুপরি গ্রামীন দারিদ্র্যই শেষ বিচারে শহুরে দারিদ্র্যে রূপান্তরিত হয়।

শহরে দারিদ্র্য ঃ ধনী মুখীন সরকারী নীতিমালা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর "ঋণখেলাপী" সংস্কৃতি বিষয়ে আমরা আমাদের "শিল্পায়ন" অধ্যায় আলোকপাত করেছি। রাজনৈতিক কারণে এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এমনকি সরকার পরিবর্তন হলেও এরা নিরাপদ থেকে যাচ্ছেন। বড়জোর এক দল অন্য দলের

লোককে বাঁচিয়ে চলেন। এমতাবস্থায় কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। এগুলো যদি উৎপাদনশীল বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছে দেয়া যেত তাহলে শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি ও কর্মসুযোগ সৃষ্টি করেই প্রচুর দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হতো। যেহেতু এগুলো উৎপাদনশীল মধ্যস্তরের বা দরিদ্র বিনিযোগকারীদের হাতে যেতো সে জন্য তাদের দ্বারা সূচিত প্রবৃদ্ধি হতো অধিকতর সমতা অভিমুখী।

সারা দেশে সরকার শিক্ষা খাতে যে ভর্তুকি দেন বা ব্যয় করেন তার একটি তুলনামূলক ভাবে বৃহৎ অংশ চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা খাতে। তুলনামূলক ভাবে কম ব্যয়ই হয় "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা" খাতে।

বাংলাদেশে রেশনে যে খাদ্য সরবরাহের নীতি আছে তা যদিও ধনীরা পায় না বা নেয় না, কিন্তু দরিদ্র বস্তি বাসী বা শহরের রিক্সা চালক স্তরের লোকেরাও এসব রেশন দ্রব্য পায় না। বস্তুত: এখন পর্যন্ত রেশনের দ্রব্যাদি মধ্যস্তরে সরকারী কর্মচারীরা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তুলনামূলকভাবে বেশি ভোগ করেন। যদিও রেশন দাম ও বাজার দামের মধ্যে পার্থক্য কমে আসার কারণে এই নীতির বিকৃত প্রতিক্রিয়া কিছুটা কমে এসেছে।

শহরে শুধু নয় সারা দেশে সরকার শিক্ষা খাতে যে ভর্তুকি দেন বা ব্যয় করেন তার একটি তুলনামূলক ভাবে বৃহৎ অংশ চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা খাতে। তুলনামূলক ভাবে কম ব্যয়ই হয় "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা" খাতে। অথচ "সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা" ছাড়া অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির কাছে শিক্ষা ব্যয়ের সুফল পৌছে দেয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু এ ধরনের ব্যয় কাঠামো সমাজে শ্রেণী বৈষম্য এবং মেধা-পাচারে উৎসাহিত করে।

সারকারী কর্মচারীদের জন্য প্রতিটি সকার যে ব্যয় করেন তার সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতার কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের অকার্যকর ব্যয় তা শুধু উৎপাদনে কোন ফল রাখছে না তা নয়। উপরোন্ত রাজস্ব ব্যয় বেড়ে গিয়ে উন্নয়ন ব্যয়ের সংকোচন ঘটাচ্ছে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নতুন কোন প্রবৃদ্ধি ও কর্মসুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারের অবদান আপেক্ষিকভাবে কমে আসছে। যাদেরকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে তারাও নানারকম অসন্তোষে ভুগছেন যেহেতু অবদানের সঙ্গে বেতনের কোন সম্পর্ক নেই।

"নীতিগত ভ্রান্তি বিভিন্ন বক্তৃতায় ইতোমধ্যেই বহুল উচ্চারিত বাণী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ নিতে গেলে যে সব গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তাদের ক্ষমতা ভিত্তি যথেষ্ট শক্ত।

প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ব্যয় প্রতিবছর প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হারে বাড়ানো হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়টি আমরা "সরকারী আয়-ব্যয়" অধ্যায়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

সর্বশেষে বলা যায় এসব "নীতিগত ভ্রান্তি" কোন নতুন কথা নয়। এগুলো বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে দাতাগোষ্ঠীর সুপারিশপত্রে, পত্র-পত্রিকায়, মন্ত্রীদের বক্তৃতায় ইতোমধ্যেই বহুল উচ্চারিত বানী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ নিতে গেলে যে সব গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের ক্ষমতা ভিত্তি যথেষ্ট শক্ত। তাই এসব নীতিগত ত্রুটির মৌলিক কারণটিও শেষ বিশ্লেষনে "ক্ষমতা কাঠামোর" মধ্যে নিহিত।

গ্রামীন খাত ঃ কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাসমূহ

গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য ঐতিসিক প্রকিয়ায় উত্তরাধিকারী সূত্রে আমরা বহন করতে বাধ্য হচ্ছি। একসময় সুদুর অতীতে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা ও সম্পদের যে ভারসাম্য ছিল তার ফলে গ্রামে আপেক্ষিক বৈষম্য থাকলেও স্থায়ী চরম দারিদ্র্য হয়তো অনেক কম ছিল।

কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষম শ্রম শক্তির সরবরাহ প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ জমিতে সকলের কর্মসংস্থান অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন অকৃষি খাতে বিকাশ উপযুক্ত মাত্রায় গ্রামে ঘটতে পারে না। ফলে গ্রামে বেকার ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই দরিদ্র মানুষরাই পরে শহরে ভিড় করেন।

বাংলাদেশের গ্রামে মাথা পিছু আবাদী জমির পরিমান ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫১-৮১ এই কালপর্বে এই অনুপাত অর্ধেকে নেমে আসে। এতে কম মাথাপিছু জমির ফসল থেকে উন্নত জীবন আহরণ করতে হলে জমির উচ্চফলনশীল উৎপাদনশীল উৎপাদন নিশ্চিত করা দরকার। কিন্তু জমির

বন্টন অসম হওয়ার কারণে একটা বড় অংশের ভূমিহীনতা যেমন রয়েছে তেমনি যারা বেশি জমির মালিক তাদের মধ্যে শ্রম দিয়ে যত্ন করে জমি চাষের প্রবনতার ঘাটতিও বিদ্যমান। ফলে কারো জমি নেই আর যার জমি আছে তা তার জন্য খুবই কম এবং ঐ কম জমিটুকুও যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

অবশ্য গ্রামে উচ্চ ফলনশীল আবাদ ও জলসেচের প্রসার না ঘটালে (১৯৬০-১৯৯০) অবস্থা নি:সন্দেহে আরো ভয়াবহ হতো। কিন্তু তা যে যথেষ্ট নয় সেটা গ্রামীন দারিদ্র্য পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কতিপয় নির্বাচিত গ্রুপের জন্য সেবা/প্রকল্পের আয়োজন করেছেন। যেমন:- খাদ্যের বিনিময়ে কাজ খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, দু:স্থ মাতাদের জন্য গম, ইত্যাদি। এসব প্রকল্প ভাল হলেও এদের কার্যকারিতা সীমিত। প্রধানত: এসব ক্ষেত্রে ব্যায় বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম, দ্বিতীয়ত: এসব ব্যয়ের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক ফোঁকর বিদ্যমান থাকায় পুরো অর্থ প্রকৃত ব্যক্তির হাতে পৌঁছায় না। অবশ্য এন.জি.ও ও গ্রামীন ব্যাংকের অবদানের কার্যকারিতা ও সেবার মান সরকারী সঙস্থাগুলোর তুলনায় অধিকতর ভাল বলে গবেষকরা মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু সামান্য কয়েকটি পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে যে এসব সংস্কার প্রচেষ্টা ইতিবাচক হলেও মূলক সমস্যার বিশাল আয়তনের তুলনায় এগুলো খুবই অপ্রতুল।

এন.জি.ও গ্রামীন ব্যাংকের অবদানের কার্যকারিতা ও সেবার মান সরকারী সংস্থাগুলো তুলনায় অধিকতর ভাল বলে গবেষকরা মূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু সামান্য কয়েকটি পরিসংখ্যান উদ্বৃত করলেই বোঝা যাবে যে এসব সংস্কার প্রচেষ্টা ইতিবাচক হলেও মূল সমস্যার বিশাল হলেও মূল সমস্যার বিশাল আয়তনের তুলনায় এগুলো খুবই অপ্রতুল।

যেমন: গ্রামীন ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প জন্মের পর প্রথম দশ বছরে মাত্র ৬ শতাংশ গ্রামে পৌঁছাতে পেরেছে। বর্তমানে তাদের গ্রাম "কভারেজ" (Coverage) হার হচ্ছে প্রায় ৬০ শতাংশ। খাদ্যের বিনিময়ে কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মোট বাৎসরিক কর্ম-মানব-দিনের মাত্র ৩ শতাংশ কর্ম মানব-দিন সৃষ্টি হচ্ছে। দু:স্থ মাতাদের গম কার্যক্রম নির্বাচিত গ্রুপের (অর্থাৎ যারা ১৬০০ ক্যালরীর নিচে রয়েছেন) মাত্র ৭.৫ শতাংশের হাতে পৌঁছায় (১৯৮৩/৮৪ সালের তথ্য)।

সরকারী ইতিবাচক প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা ছাড়াও সরকারের নিজস্ব যেসব ব্যর্থতা রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভূমিসংস্কার ও বর্গাসংস্কারের গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ সরকারগুলো এ পর্যন্ত নিচ্ছেন না। খাস-জমি বন্টনে দূনীতি রয়েছে, কৃষকদের ফসলের ব্যয় ও দামের মধ্যে উপযুক্ত উৎসাহ বজায় রাখতে সরকার ব্যর্থ হচ্ছেন এবং সরকারের কৃষি ঋণ উপযুক্ত খাতকের কাছে যাচ্ছে না।

সর্বশেষ আমরা বলবো বাংলাদেশে দারিদ্র্য শ্লথ গতিতে হ্রাস পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সম্পদ ক্ষমতা ও আয় বন্টনের কাঠামো আরো সুষম না হবে ততদিন দারিদ্র্যের দ্রুত ও কার্যকর নিরসন সম্ভব হবে না। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ গবেষনাও এ ধরনের সিদ্ধান্তের কাছাকাছি উপসংহারে পৌঁছিয়েছেন। তাদের গবেষনা পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় "মুল সিদ্ধান্তসমূহ" শিরোনামে এক নম্বর সিদ্ধান্তটিই হচ্ছে:

"১৯৮৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত মাথা গণনামূলক দারিদ্র্যের হার চরম দারিদ্র লোকদের ক্ষেত্রে ৪১ শতাংশ থেকে নেমে ৩৬ শতাংশ হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাস শ্লথ গতিতে হয়েছে তার আংশিক কারণ হচ্ছে এই সময় প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অসমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কি ধরনের দারিদ্র্য আয় রেখা ব্যবহার করবো তার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে এই সময় প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে যে পরিমান দারিদ্র্য নিরসন স্বাভাবিক ভাবেই হওয়ার কথা ছিল তার এক পঞ্চমাংশ থেকে এক তৃতীয়াঙম বাস্তবে হয় নি কারণ এই সময় আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। দারিদ্র্য নিরসনের উপর আয় বৈষম্য বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব বিশেষভাবে শক্তিশালী হচ্ছে শহর অঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে তা তুলনামূলকভাবে দুর্বল।

দারিদ্র নিরসনের উপর আয় বৈষম্য বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব বিশেষভাবে শক্তিশালী হচ্ছে শহর অঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে তা তুলনামূলকভাবে দুর্বল।"

আয় বন্টন অপিরিবর্তিত রেখে নিছক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের প্রচেষ্টা অসম্ভব না হলেও তা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ।

বিশ্বব্যাংকের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এ থেকে বোঝা যায় যে "চরম দারিদ্র্যের" সমস্যা শুধু "প্রবৃদ্ধির" মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করাটা হাস্যকর হবে। আয় বন্টন অপিরিবর্তিত রেখে (অর্থাৎ অসমতা বৃদ্ধিও পাবে না হ্রাসও পাবে না) নিছক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের প্রচেষ্টা অসম্ভব না হলেও তা অত্যন্ত দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। আমাদের দেশে যে পরিমান চরম দরিদ্র ও দরিদ্র লোক রয়েছে তাদেরকে যদি দারিদ্র্য রেখার উর্ধ্বে উঠাতে হয় তাহলে গড়ে সকলের মাথা পিছু আয় ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলে সময় লাগবে ৫১ বছর (দরিদ্রদের জন্য) এবং ৮৯ বছর (চরম দরিদ্রেদের জন্য)। যদি মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ ৪ শতাংশ হারেও বৃদ্ধি পায় (যা এখন পর্যন্ত অর্জন সম্ভব হয় নি) তাহলে সময় লাগবে ১৩ বছর (দরিদ্রদের জন্য) এবং ২৩ বছর (চরম দরিদ্রদের জন্য)। (দ্রঃ বিনায়ক সেন, ২০০০)

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ দ্বিবিধঃ কাঠামোগত বা বিষয়গত এবং নীতিগত বা বিষয়ীগত। শহরাঞ্চলে যেসব নীতিগত দুর্বলতা দারিদ্রকে টিকিয়ে রেখেছে তা হচ্ছে ধনীমুখী ঋণ নীতি, মধ্যবিত্তমুখী রেশন ব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত ব্যয়ের ঝোঁক, উন্নয়ন ব্যয়ের ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান অনুন্নয়ন ব্যয়। গ্রামে জমির অসম বন্টন, উফশী আবাদের সীমিত প্রসার গ্রামীন বেকারত্ব। এগুলো সম্পদের অসম মালিকানা এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যা প্রসূত কাঠামোগত সমস্যা। তদুপরি সরকারী "নির্বাচিত গ্রুপ সমূহের জন্য প্রকল্প/সেবা" কর্মসূচিগুলোও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং তাদের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক-ফোঁকর রয়েছে। এন.জি.ও গুলোর প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর দক্ষতার অধিকারী হলেও কাঠামোগত মূল সমস্যা নিরসনে এদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ। নিছক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরনের প্রচেষ্টা হাস্যকর বাতুলতা মাত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশের দারিদ্র্যের পেছনে মূল দু-প্রকারের কারণ হচ্ছে-
   ক. কাঠামোগত দুর্বলতা এবং নীতিগত দুর্বলতা;
   খ. দাতা দেশদের ভূল নীতি এবং দূনীতি;
   গ. সম্পদের অভাব এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা।

২. বংলাদেশের দারিদ্র্যের কাঠামোগত কারণগুলো অধিকতর সক্রিয়-
   ক. শহরে; খ. গ্রামে;
   গ. ঢাকায়।

৩. শেষ বিশ্লেষনে নীতিগত ভ্রান্তির পেছনে রয়েছে-
   ক. সচেতনতার অভাব; খ. ভ্রান্ত পরামর্শ;
   গ. কায়েমী স্বার্থের ক্ষমতা কাঠামোগত শক্তিশালী অবস্থান।

৪. বাংলাদেশে নিছক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরন যথাযথভাবে হচ্ছে না কারণ-
   ক. প্রবৃদ্ধির ফল গরীবদের কাছে পৌঁছাচ্ছে;
   খ. প্রবৃদ্ধির ফল তুলনামূলক ভাবে গরীবদের কাছে কম পৌঁছাচ্ছে;
   গ. চরম গরীবরা প্রবৃদ্ধির ফল আদৌ পাচ্ছে না এবং গরীবদের কাছে খুব কম অংশই পৌঁছাচ্ছে।

৫. বাংলাদেশে বর্তমান ক্ষমতা কাঠামো বজায় রেখে দারিদ্র্য নিরসনের যে সব সংস্কারবাদী কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোর প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে-
   ক. দূনীতি; খ. সেবার মান খারাপ;
   গ. আয়তনের অপর্যাপ্ততা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১. গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতাগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. শহরে যেসব ভ্রান্ত নীতির কারণে দারিদ্র্য দ্রুত দূরীভূত করা সম্ভব হচ্ছে না, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরী করুন।

২। কেন নিছক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ যথেষ্ট নয় তার ব্যাখ্যা দিন ।

পাঠ-৮.৫ ঃ দারিদ্র্য নিরসনের উন্নয়নকৌশল

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- দারিদ্র্য নিরসনের উন্নয়ন কৌশলগুলোর মৌলিক শ্রেনীবিভাগ;
- বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য এ যাবৎ প্রনীত দুটি বিশেষ উন্নয়নকৌশলের চরিত্র এবং তাদের বৈশিষ্ট্য;
- একটি আংশিক পদ্ধতির বিবরন যার মাধ্যমে দেখানো সম্ভব কেন নিছক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের বিশাল পল্লী দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

দারিদ্র্য নিরসনের প্রচেষ্টা ঃ তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি

দারিদ্র্য দূরীকরনের জন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই উন্নয়নবিদরা নানা সুপারিশপত্র দিয়ে থাকেন। এসব সুপারিশপত্রের চরিত্র অনেক পরিমান নির্ভর করে এদের রচয়িতাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা দারিদ্র্যের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ ধারনার উপর। অর্থাৎ কে দারিদ্র্যের কোন কারণকে প্রধান মনে করেন এবং কোন কারণকে সবচেয়ে আগে আক্রমন করতে চান তার উপর নির্ভর করে তার সুপারিশপত্রের কেন্দ্রীয় মনোযোগবিন্দু।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে সকল বিভিন্ন সুপারিশপত্রকে দারিদ্র্য নিরসনের তিনটি প্রধান উন্নয়নকৌশলে শ্রেণী বিন্যস্ত করা সম্ভব। নিচে পর্যায়ক্রমে রনকৌশলগুলোর বর্ণনা দেয়া হল:

দারিদ্র্য নিরসনের বৈপ্লবিক রণকৌশলের শেষ কথা হচ্ছে "দরিদ্রদের" ছাড়া সমাজে দারিদ্র্য দূর হবে না।

ক. দারিদ্র্য নিরসনের প্রচেষ্টা ঃ তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি

এই কৌশলের প্রস্তাবকরা মনে করে দারিদ্র্যের মূল কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ক্ষমতার অসম বন্টন। তাদের মতে অল্প কিছু লোক অতিরিক্ত ধনী বলেই বেশিরভাগ লোক সমাজে গরীব থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তারা তাই সর্বপ্রথম পুঁজির জমির শিক্ষার, মৌলিক রাজনৈতিক ক্ষমতার এবং অন্যান্য সকল ধরনের সম্পদের প্রাথমিক বন্টনকে সকলের জন্য সুষম করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। এদের দারিদ্র্য নিরসনের কৌশলের শেষ কথা হচ্ছে "দরিদ্রদের ক্ষমতায়" ছাড়া সমাজে দারিদ্র্য দূর হবে না। অর্থাৎ এই দলের উন্নয়নবিদরা ধনীদের আলোকিত ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণের চিন্তাকে প্রত্যাখান করেছেন।

সংস্কারবাদী উন্নয়নকৌশল দলের প্রবক্তারা হয় সম্পদ ও ক্ষমতার বড় ধরনের মৌলক পুনর্বন্টনে বিশ্বাসী নন অথবা তা বিদ্যমান অবস্থায় বাস্তবানুগ মনে করেন না।

খ. সংস্কারবাদী উন্নয়নকৌশল : এই দলের প্রবক্তরা হয় সম্পদ ও ক্ষমতার বড় ধরনের মৌলক পুনবন্টনে বিশ্বাসী নন অথবা তা বিদ্যমান অবস্থায় বাস্তাবানুগ মনে করেন না। সেই জন্য তারা বর্তমান ক্ষমতা কাঠামোর ভেতরে থেকেই বিশেষ ভাবে চরম দরিদ্র্যেদের অবস্থা যথাসম্ভব উন্নত করার জন্য উদ্যোগ নেয়ার সুপারিশ করেন। তাদের এই সুপারিশ প্রধানত: কতিপয় নির্বাচিত গ্রুপের কিছু সেবা/প্রকল্পের রূপ পরিগ্রহন করে। যেমন: গরীবদের জন্য বিশেষ কর্মসুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ, ক্ষুদ্র ঋণের উদ্যোগ, বিশেষ ধরনের অনুদান বা অর্থ হস্তান্তর ইত্যাদি। এসব উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা পূর্বের অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি অনেক বৈপ্লবিক রনকৌশলের প্রবক্তারাও এই ধরনের সংস্কারের পক্ষে ঝুঁকেছেন। তাদের যুক্তিটা কখনো কখনো এই রকম যে বৈপ্লবিক কৌশল কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। সুতরাং আশু ব্যবস্থাপত্র হিসাবে সংস্কারমূলক কর্মসূচি ছাড়া গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ তার দারিদ্র্য নিরসনের সংস্কারবাদী কৌশলকে "মন্দের ভাল" বা "দ্বিতীয় উত্তম" কৌশল হিসাবে গ্রহনের পক্ষপাতি।

গ. গতানুগতিক উন্নয়নকৌশল: এই কৌশলের অনুসারীরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতার উপর সব কিছু ছেড়ে দেয়ায় বিশ্বাসী। তারা মনে করেন বাজারই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করতে সক্ষম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অদক্ষতা থাকলেও তাকে দক্ষ করতে গিয়ে সরকারী

হস্তক্ষেপ আরো বেশি অদক্ষতার জন্ম দেয়। সুতরাং সর্বোচ্চ, দক্ষ ও হস্তক্ষেপহীন প্রবৃদ্ধিই দারিদ্র্য নিরসনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এরা প্রবৃদ্ধির ফল চুইয়ে পড়ে দরিদ্রদের কাছে পৌঁছায় বলে বিশ্বাস করেন এবং এভাবেই দারিদ্র্য দূরীকরনের কৌশলে বিশ্বাস করেন। অবশ্য এই কৌশল ষাট এবং সত্তর দশকে বাস্তব নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে দ্রুতই জনপ্রিয়তা হারায়। কিন্তু ৮০-র দশকে "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার" পতনের পর এই কৌশলের জনপ্রিয়তা দ্রুত লাভ দিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার ৯০ শদকে এই কৌশল নতুন করে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

গতানুগতিক উন্নয়ন কৌশলের অনুসারীরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতার উপর সব কিছু ছেড়ে দেয়ায় বিশ্বাসী।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের উন্নয়ন কৌশল ঃ টাস্ক ফোর্সের প্রস্তাবসমূহ

১৯৯০ সালে ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে অধ্যাপক রেহমান সোবাহানের পরিচালনায় ও নেতৃত্বে পরবর্তীতে নির্বাচতি সরকারের কাজের সুবিধার জন্য অর্ধনীতি, সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনেকগুলো "টাস্ক ফোর্স" গঠন করা হয়েছিল। বিনা পারিশ্রমিকে সম্পূর্ন আন্তরিক সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে এসব "টাস্ক ফেসের" বিশেষজ্ঞরা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি করনীয় তার সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন। যদিও পরবর্তী নির্বাচিত সরকারসমূহ এগুলোর অধিকাংশ প্রস্তাবকে রাজনৈতিক ভাবে সমীচীন মনে করেননি, তথাপি এদের "এ্যাকাডেমিক" মূল্য ও মান যথেষ্ট উঁচু। আমরা তাই এই পর্যায়ে "দারিদ্র্য বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের" নিপোর্ট এর বিষয়ে বর্ণনা প্রদান করবো। উল্লেখ্য যে এর মূল দায়িত্বে ছিলেন তদানিন্তন বি, আই, ডি, এস এর মহাপরিচালক ড. মহাপরিচালক ড. মাহাবুব হোসেন।

টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রধানত: তিন ধরনের সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছিল:

১. সামাজিক পরিসেবা খাতে বিশেষত: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা দরিদ্রদের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে দরিদ্র্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. বিভিন্ন ধরনের সম্পদ পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সম্পদের উপর প্রবেশধিকার প্রতিষ্ঠা। বিশেষত: আর্থিক ঋণের সুযোগ দরিদ্রদের অধিকার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।
৩. নির্বাচিত চরম দরিদ্রদের জন্য সুনির্দিষ্ট টার্গেট বা লক্ষ্য স্থির করে কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং/অথবা অর্থ হস্তান্তর বা দান-এর ব্যবস্থাকরণ।

এই প্রস্তাবগুলো "গতানুগতিক দারিদ্র্য নিরসনের" প্রস্তাব ছিল না। এগুলোকে বৈপ্লবিক ও সংস্কারবাদী প্রস্তাবসমূহের একটি আদর্শ মিশ্রন হিসাবে অভিহিত করা যায়। তবে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করাই যথেষ্ট নয়। অধিকতর জরুরী বিষয় হচ্ছে:

ক. এগুলো যথাযথ মাত্রায় করতে হলে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার পরিমান কত এবং কোথা থেকে তা জোগাড় করা সম্ভব হবে?
খ. এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যে সব নতুন নিয়ম-কানুন ও প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হবে তা কি এবং কিভাবে সেখানে দক্ষ বাস্তবায়ন ক্ষমতা নিশ্চিত করা যাবে?

রিপোর্ট শুধু কতিপয় বিমূর্ত প্রস্তাবই তুলে ধরা হয় নি, উপরন্তু এগুলো বাস্তবায়নের মূর্ত সমস্যাগুলো ও সমাধানের মূর্ত ইংগিতসমূহ ও রিপোর্ট ছিল।

বস্তুত: "টাস্ক ফোর্স রিপোর্টের" সবচেয়ে অভিনব দিকটি ছিল এই খানেই। রিপোর্ট শুধু কতিপয় বিমূর্ত প্রস্তাবই তুলে ধরা হয় নি, উপরন্তু এগুলো বাস্তবায়নের মূর্ত সমস্যাগুলো ও সমাধানের মূর্ত ইংগিতসমূহ ও রিপোর্ট ছিল। অন্তত: উপরোক্ত দুই জটিল প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য দারিদ্র্য বিষয়ক টাস্ক ফোর্স রিপোর্টের গবেষকরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

টাস্ক ফোর্স রিপোর্টের প্রথম সুপারিশ ছিল ১৯৯০-৯৫ এই পাঁচ বছরের মধ্যে সকল শিশুর জন্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ প্রতিষ্ঠিত করে একে বাধ্যতামূলক ঘোষনা করতে হবে। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রধান করণীয় হচ্ছে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে অবস্থিত স্কুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করা। তখন তারা হিসাব করে বের করেছিলেন যে বাংলাদেশে প্রতি ৩.২ বর্গ কিলোমিটারে গড়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। তারা প্রস্তাব করেছিলেন যে ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রতি দুই বর্গ কিলোমিটারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অন্তত: ১টি করতে হবে। অর্থাৎ ৫ বছরে বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুন করতে হবে। এই লক্ষ্য পূর্ববর্তী সরকারী প্রস্তাবগুলোর

নিরিখে রীতিমত একটি বৈপ্লবিক উল্লম্ফনের মত মনে হতে পারে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ববর্তী ১৯৮৫-৯০ সালের লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি করা। তাদের প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে টাস্ক ফোর্সের বিশেষজ্ঞরা ব্রাকের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির উদাহরন তুলে ধরেছিলেন। ব্র্যাকের এই কর্মসূচি প্রথম শুরু হয়েছিল এবং ১৯৯০ এর মধ্যে 'ব্র্যাক' (একটি এন.জি.ও) ৪০২৫ টি বিদ্যালয় চালু করতে সক্ষম হয়। এই মডেলের নতুন ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে:

ক. মাত্র তিন বছরের মধ্যে (৫ বছর নয়) মৌলিক স্বাক্ষরতা ও সংখ্যা-জ্ঞান সম্পন্ন করা হয়।

খ. শিক্ষকরা সাধারনত: স্থানীয় ৮ম শ্রেনী পাশ বিবাহিত মহিলারা হয়ে থাকেন যদিও তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আগে তৈরী করে নেয়া হয়। তাদের এই শিক্ষকতার কাজটা অনেকখানি সমাজ সেবামূলক এবং পরিপূরক কাজ হিসাবে তারা দেখেন। ফলে সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন যেখানে মাসিক ১২০০ টাকা, সেখানে এদের বেতনের পরিমান হচ্ছে মাত্র ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা।

গ. এসব বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনেক বেশি পরিমানে জীবনমুখী।

ঘ. শিক্ষার মূল্যায়ন ও মান রক্ষার ব্যাপারে নিয়মিত ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিবাবকদের পরামর্শ নেয়া হয়।

এছাড়া গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের এক মাসের জন্য বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের কাজে লাগানো যেতে পারে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে টাস্ক ফোর্স রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল "২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য" বস্তুত: এই লক্ষটি জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি ঘোষিত লক্ষ্য। এর বাস্তব তাৎপর্য হচ্ছে ২০০০ সালের মধ্যে বিদ্যমান গ্রামীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রগুলোর সংখ্যা দ্বিগুনে পরিনত করা। কারণ বিদ্যমান স্বাস্থ্য-সেবা কেন্দ্রগুলো তখন পর্যন্ত মাত্র ৪০-৫০ শতাংশ গ্রামীন জনগণের দ্বারে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম হতো। ১৯৮০-র দশকে গড়ে সরকারী বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে সরকারী ব্যয় মাত্র ৩.৩ শতাংশ। এই স্বল্প হারকে বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি করা ছাড়া ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা অসম্ভব বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া রিপোর্টে অন্যান্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপন হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে-

ক. সরকারের উচিত প্রতিটি ইউনিয়নে এমন একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে থেকে খুব সহজে একটি পরিবারের পক্ষে স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের নির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন।

খ. পাশাপাশি যেসব এলাকাবাসীর বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে জরুরী ভিত্তিতে অবিলম্বে তার ব্যবস্থা করা।

গ. পোলিও ডিপথেরিয়া ও হামের টিকাসমূহ যাতে প্রতিটি শিশু যথাসময়ে পেতে পারে সে জন্য টীকা দান কর্মসূচিকে প্রসারিত করা।

সম্পদের পুনর্বন্টন ও ঋণের অধিকার প্রসঙ্গে টাস্ক ফোর্স রিপোর্টে অবশ্য খুবই সতর্কতার সঙ্গে নিম্নে মাত্রার কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথমেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় পল্লী অঞ্চলের প্রধান সম্পদ জমির অসম বন্টন বিদ্যমান থাকলেও এই অসমতার পাশাপাশি বড় সমস্যা হচ্ছে মোট আবাদি জমিরই চরম দুষ্প্রাপ্যতা। যে কারণে এমন কি ১০ একর সিলিং ধার্য হলেও উদ্ধারযোগ্য উদ্ধৃত্ত আবাদী জমির পরিমান দাঁড়াবে মাত্র ২.২৬ মি. একর। যদি এই জমি ঠিক মত পুরোটা উদ্ধার হয় এবং তা কার্যত: ভূমিহীন).০৫ থেকে .৪৯ একর জমির মালিক) এবং প্রান্তিক চাষী (০.৫০ থেকে .৯৯ একর জমির মালিক) পরিবারগুলোর মধ্যে পুর্নবন্টন করা হয় তাদের বন্টন পরবর্তী অবস্থায় এসব পরিবারের গড় জমির পরিমান দাঁড়াবে মাত্র .৩৭ একর। অর্থাৎ ১০ একর সিলিং ভিত্তিতে পুর্নবন্টন কর্মসূচিও গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের "ক্ষুদ্র চাষী" (অর্থাৎ ১.৪৯ থেকৈ ২.৫০ একর) পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হবে না। তদুপরি এর পরেও যারা পুরোপুরি ভূমিহীন অর্থাৎ যাদের আদৌ কোন আবাদী জমি নাই, তারা এই কর্মসূচির নাগালের বাইরেও থেকে

যাবেন। বন্টনযোগ্য জমির এহেন দুস্প্রাপ্যতা এবং জমি পেতে আগ্রহী জনগোষ্ঠীর এহেন বিশালত্বের কারণে পুর্নবন্টনের কর্মসূচি বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হবে না বলেই তারা মত প্রকাশ করেছেন। তবে তারা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ভূমিহীন, কার্যত: ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য অ-কৃষি খাতে আয় ও কর্মসুযোগ সৃষ্টির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের মতে গ্রামীন অর্থনীতির পক্ষে আর কৃষির উপর নির্ভর করে অগ্রসর হওয়া খুবই কঠিন হবে। কৃষি খাতে সকলের কর্মসংস্থান ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠে। উতোমধ্যেই বিভিন্ন গ্রাম-জরিপলব্ধ তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে ভূমিহীন ও কার্যত: ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মোট আয়ের অর্ধেকের বেশি আসে অ-কৃষি খাত থেকে। এমনকি ক্ষুদে চাষীদের আয়ের ৬০ শতাংশ আসে ফসল বহির্ভূত অকৃষি খাতে আয় থেকে। এই বাস্তবতাকে মনে রেখে তাদের সুপারিশ হচ্ছে জমি নয়, গ্রামের দরিদ্রদের দিতে হবে পুঁজি যা দিয়ে তারা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অকৃষি খাতের আয় দিয়ে নিজেদের অবস্থানকে নিজেরাই উন্নত করতে সক্ষম হবে। লক্ষ্যনীয় যে টাস্ক ফোর্স রিপোর্টে "পুর্নবন্টনমূলক" কর্মসূচি জমির ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করে জমির যৌথ চাষের বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয় নি। এদিক থেকে টাস্ক ফোর্সের প্রস্তাব "বৈপ্লবিক সুপারিশপত্র" থেকে বেশ নিচুতে অবস্থান করছে। অবশ্য তাদের সুপারিশ "ঋণের" বা "আর্থিক পুঁজির" পুর্নবন্টনের পক্ষে। বিদ্যমান গঠিত স্থায়ী পুঁজি বা বিদ্যমান বিভিন্ন বাজারে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পুঁজির কর্তৃত্ব ভাঙ্গার জন্যেও টাস্ক ফোর্স কোন প্রস্তাব দেয় নি, টাস্ক ফোর্স কার্যত: গ্রামীন ব্যাংক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণের প্রসারের পক্ষেই ওকালতি করেছেন। তবে টাস্ক ফোর্স নিপোর্টে ক্ষুদ্র- ঋণ কর্মসূচির প্রসারের জন্য সুনির্দিষ্ট টার্গেট বেঁধে দেয়া হয়েছিল। তাদের প্রস্তাবিত সময়সীমা ছিল:

ক্ষুদে চাষীদের আয়ের ৬০ শতাংশ আসে ফসল বহির্ভূত অকৃষি খাতে আয় থেকে। এই বাস্তবতাকে মনে রেখে তাদের সুপারিশ হচ্ছে জমি নয়, গ্রামের দরিদ্রদের দিতে হবে পুঁজি যা দিয়ে তারা স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অকৃষি খাতের আয় দিয়ে নিজেদের অবস্থানকে নিজেরাই উন্নত করতে সক্ষম হবে।

ক. ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ গ্রামে গ্রামীন ব্যাংকের বা সমরূপী প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন করে .৫০ একর জমির মালিক কম গ্রামবাসীদের ন্যুনতম ২০ থেকে ৩০ শতাংশের কাছে এই ক্ষুদ্র ঋণ পৌঁছে দিতে হবে।

খ. ২০০০ সালের মধ্যে সকল গ্রামেই অনুরূপ কর্মসূচি চালু করতে হবে।

এই কর্মসূচির ব্যয়ভার বহন সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব হচ্ছে:

ক. শাখাগুলো প্রতিষ্ঠার যে স্থির ব্যয় তা বাংলাদেশ সরকারকে সামাজিক দায়িত্ব হিসাব বহন করতে হবে।

খ. ঋণ-কার্যক্রম চালু হলে তার যে দৈনন্দিন পরিচালনা ব্যয় তা বহ

উপরোক্ত উদ্যোগগুলো ছাড়া যে একটি মাত্র সহজসাধ্য জমি পুর্নবন্টনের কর্মসূচি টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়েছে তা হচ্ছে "সরকারী মালিকানাধীন" খাস জমির পুর্নবন্টন। বস্তুত: এ কর্মসূচি বর্তমানে চালু রয়েছে যদিও দুর্নীতি ও অব্যস্থাপনার কারণে তা সর্বদা সঠিক লোকের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে। রিপোর্টের সুপারিশ করা হয়েছে খাস জমি খাতে শুধুমাত্র "দুস্থ মহিলা প্রধান খানার" হাতে হস্তান্তর করা হয় এবং ঐ হস্তান্তরিত জমি আনগত: বিক্রয় অযোগ্য ঘোষনা করা হয়।

এছাড়াও পল্লীর ক্ষুদ্র চাষী ও অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আরো কতিপয় অভিনব কর্মসূচির প্রস্তাব টাস্ক ফোর্স রিপোর্ট সন্নিবেশিত হয়েছে। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় 'টাস্ক ফোর্সের" দারিদ্র্য নিরসনে কর্মসূচিটি বৈপ্লবিক ও সংস্কারবাদী কর্মসূচির একটি মিশ্রন এবং গতানুগতিক কর্মসূচির বাইরে উল্লেখযোগ্য একটি কর্মসূচি।

ক. ক্ষুদ্র চাষীদের "ঋণ-যোগ্যতা" হিসাবে করে প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষীর জন্য "ঋণ-কার্ড" প্রদান। ঐ ঋণ কার্ডের ঋণ-সিলিং পর্যপ্ত ঋণ ক্ষদ্র কৃষকরা যখন ইচ্ছা তখন যাতে তুলতে পারেন তা নিশ্চিত করা।

খ. বিভিন্ন জায়গায় উদ্যান প্রতিষ্ঠা করে উদ্যানবিদরা জ্ঞান এবং নতুন নতুন বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের উঠান সংলগ্ন শাক-সবজি চাষের জন্য এটি সহায়ক হবে।

গ. ভূমি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, যার কাজ হবে কোন দরিদ্র পরিবার যদি সংকটে পড়ে (বন্যা বা অসুস্থ্যতা বা অন্য কোন বাস্তব কারণে) তাহলে সে যাতে জমি বিক্রয়ে বাধ্য না হয় তার জন্য জমি সাময়িক ভাবে বন্ধক রেখে পরিবারটিকে ঋণ প্রদান করা। শর্ত থাকবে যে পরবর্তীতে জমির ফসলের এক চতুর্থাংশ প্রদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঐ ঋণ শোধ করে

জমির মালিক পুনরাং জমি ভূমি ব্যাংক থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে। এই ভাবে জমির "আপদকালীন বিক্রয়" রোধ করা সম্ভব হবে।

ঘ. প্রশিকা নামক একটি এন.জি.ও পরিচালিত ভূমিহীনদের জলসেচ যন্ত্র ভিত্তিক সমবায় গ্রুপ গঠনের কথাও রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয়েছে। অবশ্য শুধু গভীর নলকূপ নয় অগভীর নলকূপ এবং শক্তি চালিত পাম্প গ্রুপ গঠন করে ভূমিহীনদের ও গরীপ চাষীদের পানি বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে বলা যায় "টাস্ক ফোর্সের" দারিদ্র নিরসন কর্মসূচিটি বৈপ্লবিক ও সংস্কারবাদী কর্মসূচির একটি মিশ্রন এবং গতানুগতিক কর্মসূচির বাইরে উল্লেখযোগ্য একটি কর্মসূচি।

বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশ

বিশ্বব্যাকের বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিষয়ক গবেষনায় দারিদ্র্য নিরসনের যে রনকৌশলের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে তার ৫টি "স্তম্ভ" নিম্নরূপ:

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।

২. দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে দ্বিতীয় স্তম্ভ। বিশেষত: দরিদ্র মেয়েদের জন্য শিক্ষা বিস্তার গুরুত্বপূর্ন।

৩. তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যে সব অঞ্চল সাধারনভাবে দরিদ্র সে সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।

৪. সরকারী ব্যয় যাতে সঠিক গ্রহীতাদের কাছে পৌছায় সে জন্য "লক্ষ্য অভিমুখী ব্যয়" কৌশলের কর্মসূচি গ্রহণ। বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য "নিরাপত্তা জাল" নির্মানের ব্যবস্থা করা।

৫. এন.জি.ও.-র সঙ্গে সরকারী সংস্থাগুলো সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

দরিদ্রদের জন্য "আপেক্ষিক বৈষম্য" হ্রাসের চেয়ে "চরম বঞ্চনা" দূর করার দিকেই প্রস্তাবে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে উপরোক্ত সুপারিশগুলো টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের মত যথেষ্ট মূর্ত নয়। আরো লক্ষ্যণীয় যে সমগ্র কর্মসূচির বেশির ভাগ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর (জাতীয় পর্যায়ে বা অনুন্নত অঞ্চল)। দরিদ্রদের জন্য "আপেক্ষিক বৈষম্য" হ্রাসের চেয়ে "চরম বঞ্চনা" দূর করার দিকেই প্রস্তাবে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবের মূল সূর হচ্ছে প্রবৃদ্ধির মাধ্যমেই মূলত: দারিদ্র্য দূর হবে তবে ততদিন দরিদ্ররা যাতে বেঁচে থাকতে পারেন সে জন্য "তৈরী করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

সামগ্রিক বিবেচনায় প্রস্তাবটিকে "গতানুগতিক প্রস্তাব ও সংস্কারবাদী প্রস্তাবের" একটি মিশ্রন হিসাবে অভিহিত করা যায়।

প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন ঃ পুন:দৃষ্টিপাত

বিশেষজ্ঞরা অংক কষে দেখিয়েছেন যে যদি আপেক্ষিক আয় বৈষম্য স্থির থাকে, তাহলে আয়ের প্রবৃদ্ধি উচু হলে স্বংক্রিয়ভাবে দরিদ্র ব্যক্তিরা অ-দরিদ্র হয়ে যেতে বাধ্য। এই অংকের ফাঁক দু-জায়গায়। প্রথমত: প্রবৃদ্ধির হার খুব বেশি উঁচু করা সহসা সম্ভব নয়। সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির যে ঐতিহাসিক হার বাংলাদেশে ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে সেই হারে দারিদ্র্য রেখার উপর উঠে আসার জন্য দরিদ্রদের এত বেশি সময় লেগে যেতে পারে যে তখন "দারিদ্র্য রেখার আয়" হয়তো ঐতিহাসিক ভাবে নৈতিক ভাবে আবার পুনরায় আরো উপরে উঠে যেতে পারে। ফলে অবস্থা "পুনমুর্ষিক ভব," হয়ে যেতে পারে।

সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধির যে ঐতিহাসিক হার বাংলাদেশে ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে সেই হারে দারিদ্র্য রেখার উপর উঠে আসার জন্য দরিদ্রদের এত বেশি সময় লেগে যেতে পারে যে তখন "দারিদ্র্য রেখার আয়" হয়তো ঐতিহাসিক ভাবে নৈতিক ভাবে আবার পুনরায় আরো উপরে উঠে যেতে পারে। ফলে অবস্থা "পুনমুর্ষিক ভব," হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত: উচ্চ প্রবৃদ্ধি সবসময়ই যে সমহারে ধনী ও দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। প্রবৃদ্ধির চরিত্রের উপর তা অনেকাংশে নির্ভর করে। বি.আই.ডি.এস গবেষক ড. বিনায়ক সেন আয় প্রবৃদ্ধির পেছনে যেসব উপাদান কাজ করে সেগুলোকে স্বাধীন চলক হিসাবে এবং গ্রামের দরিদ্রদের আয় বা ধনীদের আয়কে নির্ভরশীল চলক ধরে নিয়ে পৃথক পৃথক নির্ভরন রেখা নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। এই অনুশীলনী থেকে দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধিতে

উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অবদান সক্ষম এরকম ৮টি উপাদানকে চিহ্নিত করা সম্ভব। নির্ভরাংকের মান অনুযায়ী গুরুত্বের ক্রমানুসারে গ্রামাঞ্চলে এই উপাদানগুলো হচ্ছে:

১. জমির মালিকানার পরমান।
২. জমিতে উফশী আবাদের অনুপাত।
৩. পরিবারে উপার্জনশীল লোকের সংখ্যা।
৪. উপার্জনশীল সদস্যদের মধ্যে অকৃষি খাতে নিয়োজিত ব্যক্তির অনুপাত।
৫. জমি বহির্ভুত অকৃষি সম্পদের মালিকানা।
৬. পরিবারসমূহ যাদের পরিবার প্রধানের প্রাথমিক শিক্ষা রয়েছে।
৭. পরিবার প্রধানের উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা।
৮. গ্রামে যদি বিদ্যুৎ এবং উন্নততর রাস্তা-ঘাট থাকে।

এ কথা ঠিক যে নিছক নির্ভরন অনুশীলন থেকে কোন কার্যকরণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু এই অনুশীলন থেকে আমরা কিছু অন্তর্নিহিত সরল সত্যের পরিচয় পাচ্ছি। যেমন:

ক. ধনীদের জমি গরীবদের দিলে ধনীদের আয় কমবে কিন্তু গরীবদের আয় বাড়বে।

খ. উফশী চাষকে উৎসাহিত করলে, ধনীরা যতখানি উপকৃত হবেন, এখন পর্যন্ত তুলনায় দরিদ্রদের আয়-উন্নতি বেশি হবে।

গ. অকৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হলে গ্রামীন শিল্প, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য চাষ এবং আত্মকর্মসংস্থানের প্রসার ঘটবে এবং তাতে গরীবরা এবং ধনীরা উভয়ই উপকৃত হবেন। কিন্তু গরীবদের যদি উপযুক্ত শিক্ষা, অকৃষি সম্পদ ও ঋণের উপর মালিকানা না থাকে তাহলে ঐ প্রবৃদ্ধির ফল প্রধানত: ধনীদের পকেটে চলে যেতে বাধ্য।

ঘ. উপযুক্ত অবকাঠামো তথা বিদ্যুৎ ও রাস্তাঘাট তৈরী হলে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান হয় এবং তাতে ধনীদের পাশাপাশি দরিদ্ররাও উপকৃত হবে। যদিও তা হবে অপেক্ষাকৃত কম হারে।

নিছক প্রবৃদ্ধি নয়, বরং বিশেষ ধরনের প্রবৃদ্ধি যার মধ্যে গরীবের পক্ষে পুর্নবন্টনের ঝোঁকটি অন্তর্নিহিত ভাবে বিদ্যমান আছে, তার দ্বারাই কার্যকরভাবে দরিদ্র নিরসন হতে পারে।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় উপরোক্ত নির্ভরন অনুশীলনী থেকে কার্যকারণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও এটা অন্তত: নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে নিছক প্রবৃদ্ধি নয়, বরং বিশেষ ধরনের প্রবৃদ্ধি যার মধ্যে গরীবের পক্ষে পুর্নবন্টনের ঝোঁকটি অন্তর্নিহিত ভাবে বিদ্যমান আছে, তার দ্বারাই কার্যকর ভাবে দারিদ্র্য নিরসন হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য নিরসনের কৌশলগুলোকে মোটামুটি তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা সম্ভব। বৈপ্লবিক কৌশলের মনোযোগ বিন্দু হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পুর্নবন্টন। দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন ছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয় বলে এই মতের প্রবক্তরা প্রচার করে থাকেন। সংস্কারবাদী কৌশলের প্রবক্তারা প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যেই দরিদ্রদের নির্বাচিত গ্রুপগুলোর বিশেষত: চরম দরিদ্রদের আয় শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু পরিমান উন্নতির প্রয়াস চালান। গতানুগতিক কৌশলের প্রবক্তাদের মনোযোগবিন্দু হচ্ছে "প্রবৃদ্ধি"। ১৯৯১ সালে ড. মাহাবুব হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি টাস্ক ফোর্স বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বিস্তৃত একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এই প্রস্তাবটির চরিত্র ছিল যথেষ্ট মূর্ত এবং বৈপ্লবিক ও সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটি ভারসাম্যবাদী মিশ্রনের অনুরূপ। এছাড়া সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের পেশকৃত আরেকটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. দারিদ্র্য নিরসনের মধ্যে যে তিন ধরনের দৃষ্টিভংগী রয়েছে সেগুলো হচ্ছে-
   ক. উচ্চ, মাধ্যম ও নিম্ন দৃষ্টিভংগী;
   খ. বেশি সংস্কারপন্থী, মাধ্যম সঙস্কারপন্থী এবং নিম্ন সংস্কারপন্থী দৃষ্টিভংগী;
   গ. বৈপ্লবিক, সংস্কারবাদী ও গতানুগতিক দৃষ্টিভংগী।

২. দারিদ্র্য নিরসনের সংস্কারবাদী প্রবক্তারা মনোযোগ বিন্দু হচ্ছে-
   ক. প্রবৃদ্ধি; খ. বিপ্লবী পুনর্ববন্টন;
   গ. টার্গেট গ্রুপের জন্য ব্যয়।

৩. দারিদ্র্য নিরসনের গতানুগতিক কৌশলের প্রবক্তাদের মনোযোগ বিন্দু হচ্ছে-
   ক. .....; খ. .....;
   গ. ..... ।

৪. দারিদ্র্য নিরসনের বৈপ্লবিক কৌশলের প্রবক্তাদের মনোযোগ বিন্দু হচ্ছে-
   ক. .....; খ. .....;
   গ. ..... ।

৫. বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য বেশ বিস্তৃত ও মূর্ত একটি সুপারিশপত্র তৈরী হয়েছিল-
   ক. ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে; খ. ১৯৯১-১৯৯৬ সময়কালে;
   গ. ১৯৮২-১৯৯০ সময়কালে; ঘ. কখনোই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সরকারি বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপ অভিমুখীন কর্মসূচিগুলো কি?
২. ব্র্যাক পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর বৈশিষ্ট্য কি দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. "প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য নিরসনের জন্য যথেষ্ট নয়, কারণ সব ধরনের প্রবৃদ্ধিই দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখে না", ব্যাক্যা করুন।
২। বিশ্বব্যাংকের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলের বৈশিষ্ট্যগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষন প্রদান করুন।
৩. বাংলাদেশে আপনার নিজ গ্রামে দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কি ধরনের সুপারিশ করবেন, তা লিখুন।